ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম শিক্ষা।

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের আগমন কাল হইতে

লর্ড ল্যান্সডাউনের আগমন পর্য্যন্ত।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত

। অষ্টম সংস্করণ। ।

কলিকাতা,

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

৩১ নং বীডন্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

নূতন সংস্করণের

ভূমিকা।

দশবৎসর অতীত হইল, আমি ভারতবর্ষের এই ক্ষুদ্র ইতিহাস খানি বালকদিগের পাঠার্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভারগ্রহণ করেন। তাঁহার উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমে অদ্য এই পুস্তকখানি বঙ্গদেশের অনেক জেলার বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

গত দশবৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং আমাদিগের অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমি যেরূপ অবকাশ পাইয়াছি, এবং যতদূর সক্ষম হইয়াছি, উল্লিখিত গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি পাঠ ও আলোচনা করিয়াছি। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, আমি রাজকীয় কার্য্য হইতে দুই বৎসরের অবসর লইয়া আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদসংহিতার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি অনেকগুলি সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষায় রচিত পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি বিস্তারিত ইতিহাস ইংরাজী ভাষায় তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি। এইরূপ আলোচনা ও পরিশ্রম দ্বারা আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে যে নূতন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার সারাংশ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করি-

লাম। ফলতঃ এই পুস্তকের প্রথমভাগ অর্থাৎ হিন্দুস্বাধীনতাকালের বিবরণ পুনরায় ভাল করিয়া লিখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। গুরুদাসবাবুও এই সময় আমাকে অনুরোধ করাতে আমি ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম। সম্প্রতি দুইমাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া দার্জিলিং পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া এই কার্য্যটি সম্পাদন করিয়াছি।

হিন্দুস্বাধীনতাকালের প্রকৃত ইতিহাস নাই—এইরূপ একটি কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কথাটি বড় বিস্ময়কর। হিন্দুগণ প্রাচীন শাস্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া যেরূপ যত্ন সহকারে বহুসহস্র বৎসর রক্ষা করিয়াছেন, জগতের কোনও দেশে, কোনও জাতি সেরূপ করেন নাই। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতি অনন্ত গ্রন্থাদি আমাদের বড় আদরের ধন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু যত্নে এ ধন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ; আমরা আজ এ ধনের উত্তরাধিকারী। এই বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার অন্বেষণ করিলে কি ইহার মধ্যে ইতিহাস-রত্ন মিলে না ? সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কার্য্যপরম্পরা এবং চিন্তাপরম্পরা কি জানা যায় না ? যদি তাহা জানাযায় তবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, এ বাক্যে অর্থ কি ?

দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের যত্নে গত একশত বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতভাষার গ্রন্থসমুদয়ের অনেকটা কাল নির্ণয় হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে আমরা প্রাচীন কালের কোন সময়ের বিবরণ ও আচার ব্যবহার জানিতে ইচ্ছা

করিলে সেই সময়ের রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলেই সমস্ত জানিতে পারি। যে কালে হিন্দু-আর্য্যগণ সিন্ধুনদতীরে প্রথমে হিন্দু-রাজ্য বিস্তারকরেন ও বর্ব্বর দস্যুদিগকে বহুসংখ্য যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করেন, অথবা দুর্গম পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশে তাড়াইয়া দেন, সেকালের বিবরণ, হিন্দু আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মবিশ্বাস আমরা ঋগ্বেদ সংহিতার সরল ও সুন্দর কবিতায় জানিতে পারি। পরে, যে কালে হিন্দুগণ শতদ্রুনদী পার হইয়া গঙ্গা ও যমুনাতীরে অনেকগুলি পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিলেন, যে কালে কুরুগণ, পাঞ্চালগণ, কোশলগণ, বিদেহগণ, কাশীজাতীয়গণ এবং অন্যান্য হিন্দুজাতিসমূহ প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীর হইতে গণ্ডক নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অধিকৃত করিলেন, সে কালের বিবরণ আমরা বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ নামক গ্রন্থে প্রাপ্ত হই; এবং তখনকার আচার ব্যবহার কতকটা মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাহার পর যে সময়ে নূতন মগধরাজ্য আর্য্য-সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভকরে, যে কালে কপিল, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ ষড়্দর্শন প্রণয়ন করেন, গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং পাটলিপুত্রের নূতন মৌর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত উত্তরভারতবর্ষ একছত্র করেন, সে কালের ইতিহাস আমরা সংস্কৃত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক নামক গ্রন্থ এবং গ্রীকদিগের রচিত ভারতবর্ষ বিবরণে অনেকটা প্রাপ্ত হই। পরে যে কালে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র প্রাতঃস্মরণীয় অশোকরাজ

ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং সিংহলদ্বীপ হইতে গ্রীস ও মিসরদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে প্রেরণ করেন, যে কালে মৌর্য্যবংশীয়দিগের অবনতির পর প্রথমে দক্ষিণাপথের অন্ধ্র রাজগণ, তৎপর কান্যকুব্জের গুপ্তবংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করেন, সে কালের ইতিহাস আমরা ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের পর্ব্বতে ও স্তম্ভে খোদিত রাজাদেশ হইতে অনেকটা জানিতে পারি, এবং তখনকার আচার ব্যবহার আমরা মনুসংহিতা এবং চীনভ্রমণকারীদিগের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। পরে যখন প্রাতঃস্মরণীয় বিক্রমাদিত্য বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুগৌরব সংস্থাপন করেন, যখন হিন্দুগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসাহিত্য ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের দীপ প্রজ্জ্বলিত হইল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের দীপ ক্রমে হীনপ্রভ হইতে থাকিল, তখনকার বিবরণ আমরা বিস্তীর্ণ পুরাণসমূহে, পরাশরাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে ও কালিদাসাদির কাব্যে প্রাপ্ত হই। ইহার পরই প্রাচীনহিন্দুরাজ্য সমুদয় ধ্বংসপ্রাপ্তহইল, রাজপুতগণ নব্যভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন, এবং তাঁহারাও শীঘ্র মুসলমানদিগকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন এবং ভারতবর্ষ ক্রমে মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

এইরূপে হিন্দুস্বাধীনতাকালের ইতিহাস আমি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিতে যত্নবান হইয়াছি। এ প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারের দ্বার এক্ষণে রুদ্ধ নহে। ভাণ্ডারের পথ প্রশস্ত এবং অনর্গল, ভাণ্ডারের রত্নরাজি প্রকাশিত ও আলোক-

পূর্ণ। সেই বহুসহস্র বৎসরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া দুই একটি মণিমুক্তা আমি আধুনিক বিদ্যালয়ের বালকদিগকে সস্নেহে অর্পণ করিতেছি ; ভরসা করি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঔৎসুক্যপূর্ণ হইয়া এই পৈতৃক ভাণ্ডার নিজ চক্ষে দর্শন ও তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিবে।

মুসলমান-শাসনকালের যে বিবরণ দশবৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। এই অংশেও আমি কেবল সম্রাটদিগের কার্য্য-প্রণালী বিবৃত করিয়া ক্ষান্ত থাকি নাই। জনসাধারণের আচারব্যবহার, অবস্থা ও সভ্যতার যতদূর সাধ্য বিবরণ দিয়াছি বেণিয়ে নামক ফরাসী ভ্রমণকারী এ দেশে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বাসকরিয়াছিলেন। তিনি এদেশের লোক সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্ব্বে আমি ইংরাজ শাসন কালের যে বিবরণ দিয়াছিলাম তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। এই দোষ সংশোধনার্থ পুস্তকের এই অংশটীও সমস্ত পুনরায় সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের রাজ্যাধিকারের স্থূল স্থূল ঘটনা গুলি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন ইংরাজ শাসন কর্ত্তাদিগের কার্য্য প্রণালী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতির সহিত লিখিত হইয়াছে, ফলতঃ পুস্তকের এই অংশটি যাহাতে বালকদিগের সহজে বোধগম্য হয় এবং অনায়াসে মনে থাকে, এক্ষণে সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবাসীদিগের অতীত গৌরবের কারণ, ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায়। পূর্ব্বকালের মহিমা স্মরণ করিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, আধুনিক অবনতির কারণগুলি জানিতে পারিলে সংশোধনের উপায় অবলম্বন করা যায়। সরল হৃদয়ে দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা ভারতবাসীদিগের ভাবী উন্নতির অব্যর্থ উপায়। আজ কাল সেই উন্নতির দুই একটি লক্ষণ নয়ন গোচর হইতেছে। কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি জাতি বিষয়ে, কি রাজনৈতিক বিষয়ে,কি সামাজিক বিষয়ে,—যেথানে বিচ্ছেদ ছিল, সেথানে সম্মিলনের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, যেথানে অনৈক্য ছিল, সেথানে ঐক্যের লক্ষণ নয়ন গোচর হইতেছে। নানা স্থানে বাস করিয়া ও নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও যাঁহারা যতটুকু সাধ্য, এই একতা সাধনে যত্নবান্ হইতেছেন, তাঁহারা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন ও পূজার্হ। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বঙ্গীয় বালকমাত্রেরই হৃদয়ে এই ঐক্যভাব কথঞ্চিৎ সংস্থাপিত হয়, পূর্ব্ব গৌরবের কথা কথঞ্চিৎ জাগরিত হয়, ভ্রমসংশোধনের ও উন্নতির উপায়াবলম্বনের ইচ্ছা ও উৎসাহ কথঞ্চিৎ দৃঢ়ীভূত হয়,—ইহাই আমার উদ্দেশ্য ও একান্ত বাসনা।

ময়মনসিংহ।
১৫ই নবেম্বর ১৮৮৯। } শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সিন্ধুতীরে হিন্দুরাজ্যবিস্তার।

অনুমান ২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০
পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

আদিম আর্য্যজাতি। অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে অক্শস্ ও জাক্শার্টীস নদীতীরে আদিম আর্য্যজাতি বাস করিত। হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমক, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ওলন্দাজ, দিনেমার, স্পানীয়, রুশীয় প্রভৃতি অনেক জাতি প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন।

আর্য্য উপনিবেশ সমূহ। প্রাচীন আর্য্যগণ ভ্রমণ-পটু ছিলেন। সুতরাং নিজের চঞ্চলতা বশতই হউক, গৃহ-বিচ্ছেদ কারণেই হউক, খাদ্যের অভাবের জন্যই হউক অথবা পূর্ব্বদিকে তুরাণীয় জাতিদিগের আক্রমণ হেতুই হউক, আর্য্যগণ সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দাক্ষিণদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণপূর্ব্বক নূতন নূতন আবাসস্থান অন্বেষণ করিতেন এবং বর্ব্বর জাতিদিগকে জয় করিয়া ঐ সকল নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন।

এরূপ কত দেশে কত উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। বোধ হয়, অনেক আর্য্যউপনিবেশ, কালে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে ; তথাপি প্রধান উপনিবেশ গুলি এখনও বিদ্যমান আছে। সেই উপনিবেশ সকল এই ছয় সহস্র বৎসরের পর অদ্যাপি জগতের সকল জাতির মধ্যে পরাক্রান্ত ও সুসভ্য। আমরা সেই প্রধান উপনিবেশ কয়টীর কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

১। ইউরোপের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে যে স্লাবনীয় জাতি অদ্যাপি বাস করেন, তাঁহারা আর্য্যসন্তান ; বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আধুনিক রুশীয় ও পোলগণ স্লাবনীয় আর্য্য।

২। ইউরোপের মধ্যাংশে যে লিথনীয় জাতি বাস করেন, তাঁহারাও আর্য্যজাতির শাখা মাত্র। আধুনিক প্রুশীয়গণ অধিকাংশই লিথুনীয় আর্য্য।

৩। ইউরোপের পশ্চিমে যে মহাপরাক্রান্ত টিউটন জাতিগণ বাস করেন, তাঁহারাও আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন। আধুনিক জর্ম্মাণ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি বহু-জাতি টিউটন্ আর্য্য।

৪। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে মহাপরাক্রান্ত কেল্টিক জাতি বাস করেন, তাঁহারাও আর্য্যজাতির শাখা মাত্র। আধুনিক স্পানীয়, ফরাসী, আইরিশ প্রভৃতি অনেক জাতি কেল্টিক আর্য্য।

৫। পূর্ব্বকালে যে গ্রীক ও রোমীয় জাতি ইউরোপে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর্য্য

জাতির হেলেনিক্ শাখা। আধুনিক গ্রীক ও ইতালীয়গণ হেলেনিক্ আর্য্য।

হিন্দুদিগের সিন্ধুতীরে উপনিবেশ। যে সময়ে আর্য্যগণ বিদেশে এইরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, সে সময়ে স্বদেশেও তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বা পূর্ব্বদিকে তুরাণীয়দিগের উৎপীড়ন হেতু তাঁহারা ক্রমশঃই দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে ছিলেন। কালক্রমে আধুনিক পঞ্জাবের উত্তর অংশ ও কাবুল দেশ আর্য্যরাজ্যের অন্তর্গত হইল। ক্রমে এই বিস্তীর্ণ রাজ্য-নিবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে একটি গৃহবিচ্ছেদ হইল।

এই গৃহবিচ্ছেদের সকল কারণ এক্ষণে বিশেষরূপে জানা যায় না, কিন্তু ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতাই যে ইহার প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। আর্য্যদিগের মধ্যে এক দল সামান্য সোমরস ও শস্যাদি আহার করিতেন; অন্য এক দল সেই সোমরসকে মাদকদ্রব্যরূপে পান করিতেন এবং মাংসপ্রিয় ছিলেন। প্রথম দল পূজনীয় দেবতাদিগকে ঐরূপ সোমরস ও শস্যাদি দান করিয়া পূজা করিতেন; দ্বিতীয় দল মাদক-রস ও মাংস দিয়া আরাধনা করিতেন। প্রথম দল আপন আপন আরাধ্যকে "অসুর" বলিয়া পূজা করিতেন, এবং দ্বিতীয় জাতির আরাধ্যকে "দেব" বলিয়া ঘৃণা করিতেন; দ্বিতীয় দলও সেইরূপ আপনাদিগের আরাধ্যকে "দেব" বলিয়া পূজা করিতেন এবং প্রথম জাতির আরাধ্যকে "অসুর" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ক্রমে অসুর-পূজক ও দেব পূজকদিগের মধ্যে মহা বিরোধ ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং

দুই জাতি বিভিন্ন হইয়া গেলেন। অসুর-পূজকগণ অর্থাৎ প্রাচীন পারসিক বা ইরাণীয়গণ, পারস্য বা ইরাণ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। দেব পূজক অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুগণ ভারতবর্ষের সিন্ধুতীরে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। অনুমান ২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সজ্ঘটিত হয়। এই কাল হইতে হিন্দু ইতিহাসের আরম্ভ।

অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ। আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অতি অসভ্য জাতীয় লোক বাস করিত। ফলতঃ এক্ষণে যে ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিসকল পর্ব্বতে ও জঙ্গলে বাস করে, তাহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী; তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এক কালে সমস্ত ভারতবর্ষে অধিবাস করিত। আর্য্যদিগের সহিত বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও দেশচ্যুত হইয়াই তাহারা উর্ব্বর প্রদেশ সমস্ত ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে। নবাগত আর্য্যগণের সিন্ধুনদ পার হইবার অচিরকাল পরেই এই আদিম অসভ্য জাতিদিগের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ছিলেন, ও আদিমবাসিদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সর্ব্বদাই ঘৃণা করিতেন; এবং এই কৃষ্ণকায় শত্রুর ধ্বংসের জন্য দেবতার নিকট সদাসর্ব্বদাই আরাধনা করিতেন। বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধের পর আদিম অধিবাসিগণ ক্রমে পরাজিত হইল ও সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ (পঞ্জাব প্রদেশ) আর্য্যদিগের হস্তগত হইল। যখন বেদের মন্ত্রগুলি রচিত হয়, তখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এই প্রদেশ

খণ্ড অধিকার করিয়াছেন, এবং কেবল এই প্রদেশের কথাই গীতে উল্লেখ করিয়াছেন। বিজিত অসভ্য জাতির অনেকেই আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, অবশিষ্ট অংশ জঙ্গল ও পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল।

যে আর্য্য নরপতিগণ অনার্য্যদিগের সহিত এই বিষম যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সুদাস একজন প্রসিদ্ধ বীর। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে আমরা অবগত হই যে, একদা তাঁহার শত্রুপক্ষীয় দশজন রাজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া আর্দীনা নামক একটি নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া, সুদাস রাজাকে অবরোধ ও জয় করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আর্দীনা নদীর স্রোত পূর্ব্ব পথ দিয়াই প্রবাহিত হইল; সুতরাং সুদাস রাজার গতি রোধ না হওয়ায় শত্রুগণই শীঘ্র পরাজিত হইল। ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্যান্য অংশ হইতে আমরা অবগত হই যে, অনার্য্যগণ নদীতীরস্থ জঙ্গলে গোপন ভাবে বাস করিত এবং অবকাশ পাইলে আর্য্য-হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিত এবং তাঁহাদিগের গ্রাম ও নগর সকল লুণ্ঠন পূর্ব্বক গো-মহিষাদি হরণ করিয়া পুনরায় গুপ্ত স্থানে পলায়ন করিত। সীকা, অঞ্জসী, কুলিশী এবং বীরপত্নী নদীর তীরে এইরূপে লুক্কায়িত থাকিয়া কুযব নামক অনার্য্য বীর মধ্যে মধ্যে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিত এবং অংশুমতী-নদীতীরে কৃষ্ণ নামক আর এক জন অনার্য্য বীর দশ সহস্র সৈন্য লইয়া বাস করিত। কিন্তু অনার্য্য বীরদিগের বীরত্ব কৌশল ব্যর্থ হইল; পাঁচ কি ছয় শত বৎসরের মধ্যে

অর্থাৎ পূঃ খৃঃ ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসরের মধ্যে সি
হইতে শতদ্রু ও সরস্বতী নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদে
হিন্দু-প্রাধান্য বিস্তারিত হইল।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প। এইরূপ বহুসংখ্য যু
দ্বারা হিন্দুরাজ্য বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং তাহার সং
সঙ্গে হিন্দু সভ্যতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে প্রদেশ পূ
জঙ্গলময় ছিল, এক্ষণে তথায় কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইল এব
ক্রমে গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত হইতে লাগিল। আধুনিক হিন্দ
দিগের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুগণও কৃষিপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার
যব, গোধূম প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপাদন করিতেন
তাঁহারা কৃষিকার্য্যের দেবতা ক্ষেত্রপতিকে আরাধনা করিতেন
বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র ও পর্জ্জন্য দেবের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থন
করিতেন এবং ভূমিতে লাঙ্গল দ্বারা যে রেখা অঙ্কিত হইত
সেই রেখাকে সীতা-দেবী বলিয়া পূজা করিতেন। কৃষিকার্য
ও পানাদির জন্য অনেক কূপ খনন করিতে হইত এবং ঘটি
চক্র নামক যন্ত্র দ্বারা সেই কূপ হইতে জল উঠাইয়া ক্ষে
সমুদায় সিক্ত করা হইত। এইরূপ উপায় অবলম্বন ন
করিলে শুষ্ক পঞ্জাব প্রদেশে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না।

সে সময়ের হিন্দুগণ কৃষি ভিন্ন পশুচারণ ও বাণিজ
ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতেন। পশুদিগের আহার্য্য উত্ত
ঘাস, সকল সময়ে সকল স্থানে পাওয়া যাইত না, সুতরা
পশুপালকগণ সময়ে সময়ে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রম
করিতেন এবং পথে কোন রূপ বিপত্তি না ঘটে, এজন্য পূষন্
নামক দেবতাকে সর্ব্বদা আরাধনা করিতেন। বাণিজ্যের জন্য

[ভ]দ্র হউক ; পতি-শুশ্রূষা-পরায়ণা হও ; পশুদিগেরও মঙ্গল বিধান কর। তোমার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল হউক ; তোমার সৌন্দর্য্য মঙ্গলকারিণী হউক। বীরপ্রসবিনী হও, দেব সেবা-[প]রায়ণা হও। দাস দাসী ও গৃহপালিত পশুর মঙ্গলকারিণী [হ]ও।”

সেই প্রাচীনকালে গর্হিত সতীদাহ প্রথা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। পতির বিয়োগ হইলে নারীগণ অন্য পতি বরণ করিতে পারিতেন এবং যে পুরুষ বিধবাকে বিবাহ করিতেন তাঁহাকে “দিধিষু” বলা যাইত।

মৃত্যুর পর শবদাহ করা হইত এবং তাহার ভস্ম ভূমিতে সংস্থাপিত করা হইত। অতি প্রাচীন কালে শবদাহ না করিয়াই মৃত্তিকায় সংস্থাপিত করা হইত, ঋগ্বেদে তাহারও [প]রিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মপ্রণালী। সেই প্রাচীন কালের সরলচিত্ত হিন্দুগণ [প্র]কৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বা গৌরবান্বিত দেখিতেন, [ত]াহাই দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। সুন্দর আলোক-[পূ]র্ণ নভোমণ্ডলকে দ্যৌঃ বলিয়া পূজা করিতেন এবং আকাশ ও [পৃ]থিবীকে দ্যাবা পৃথিবী বলিয়া আরাধনা করিতেন। আবার [সে]ই আবরণকারী আকাশ-দেবকে অনেক সময় পুণ্যাত্মা [ব]রুণ বলিয়া উপাসনা করিতেন। বরুণ তখন সমুদ্র বা জলের [দে]বতা ছিলেন না, আকাশের পবিত্র দেবতা ছিলেন। হিন্দু-[গ]ণ পাপমোচনের জন্য তাঁহাকে সরল হৃদয়ে আরাধনা [ক]রিতেন।

আবার আকাশ হইতে বৃষ্টি পতিত হয়, সেই বৃষ্টি দ্বারা

শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া মানবজাতি জীবন ধারণ করে; সুতরাং কৃতজ্ঞ হিন্দুগণ সেই বৃষ্টিদাতা আকাশকে ইন্দ্র নাম দিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। যে মেঘ বৃষ্টিদানে বিরত, তাহাকে হিন্দুগণ বৃত্র কহিতেন, ইন্দ্রদেব মেঘকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া বারি আকর্ষণ করেন, প্রাচীন হিন্দুগণ এইরূপ কল্পনা করিতেন এবং তাহা হইতে বৃত্রসংহারের পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে। রাত্রি যোগে দিবার আলোক লীন হইয়া যায়, প্রাচীনআর্য্যগণ কল্পনা করিতেন যে, দেব-শত্রু পণিগণ সেই আলোককে হরণ করে, পরে ইন্দ্রদেব সরমা-দ্বারা সেই গুপ্ত আলোকের সন্ধান পাইয়া প্রাতঃকালে সেই আলোকের উদ্ধার করেন। এইরূপ নানা কল্পনা ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল কবির কল্পনা হইতে আধুনিক সময়ে অনেক পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনআর্য্যগণ ভীষণ ঝড় ও বাত্যাকে মরুৎ বলিয়া উপাসনা করিতেন; আলোকপূর্ণ আকাশকে মিত্র বলিয়া আহ্বান করিতেন, এবং অনন্ত আকাশের অনন্ত আলোক রাশিকে অদিতি বলিয়া স্তুতি করিতেন। সেই অদিতির সন্তান আদিত্যগণ, তাঁহাদের মধ্যে সূর্য্য ও সবিতৃ বিশেষ আরাধনার পাত্র। আধুনিক ব্রাহ্মণ যে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের আরাধনা করেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। বহু প্রাচীন কালে জাতি-গত বিভিন্নতা ছিল না, হিন্দুমাত্রেই সেই পবিত্র গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া সবিতৃ-দেবের আরাধনা করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেষপালকগণ সূর্য্যকে পূষন্

...র্য আরাধনা করিতেন এবং কৃষকগণ বৃষ্টিদাতা পর্জন্য দেবকে স্তুতি করিতেন। বিষ্ণু সেকালে সূর্য্যদেবের একটি নাম মাত্র ছিল, রুদ্র বজ্রের একটি নাম ছিল এবং ব্রহ্মার অর্থ স্তুতি বা স্তুতির দেবতা। প্রাচীন হিন্দুগণ নরক জানিতেন না, সুতরাং যমকে নরকের রাজা বলিয়া পূজা করা হইত না; তাঁহারা যমকে পরকালের ঈশ্বর এবং পুণ্যাত্মা মনুষ্যের স্বর্গসুখদাতা বলিয়া স্তুতি করিতেন।

অগ্নি না হইলে যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইত না, অতএব অগ্নি একজন প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিলেন। সোমরসও যজ্ঞের আবশ্যকীয় দ্রব্য, অতএব সোমরসেরও অনেক স্তুতি আছে। বায়ুর আরাধনা কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়া পূজা করা হইত। ঐ নাম হইতে পৌরাণিক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।

আধুনিক দেবদেবী, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ, গণেশ ও কার্ত্তিকেয়, দুর্গা, কালী এবং লক্ষ্মী, ঋগ্বেদের অপরিচিত। তবে সরস্বতী ঋগ্বেদের একজন আরাধ্যা দেবী এবং উষা দেবীও প্রাচীনহিন্দুদিগের বিশেষ স্তুতি ও আরাধনার পাত্রী ছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুগণ যদিও প্রকৃতির অনন্ত সুন্দর বস্তুকে নানারূপ নাম দিয়া নানা দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন, তথাপি কালক্রমে তাঁহারা এই সমস্ত বস্তুর প্রণেতা এক ঈশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চিন্তাশীল ঋষিগণ সূর্য্য, গগন এবং উষাকে স্তুতি করিতেন বটে,

কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, এ সকল পদার্থই সৃষ্টপদার্থমাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল মাত্র পরমেশ্বর এবং সেই পরমেশ্বরকে তাঁহারা হিরণ্যগর্ভ বা বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া আরাধনা করিতেন।

তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন—"সেই সর্ব্বজ্ঞ পিতা বিশেষ চিন্তা সহকারে জলীয় আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্নরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া দিলেন।

"সেই বিশ্বকর্ম্মা অতি মহান। তিনি সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বধারণকর্ত্তা; তিনি সকলের উপর ও সর্ব্বদর্শী। তিনি সপ্তর্ষি নক্ষত্রের উপরেও বাস করেন। বিজ্ঞ লোকে তাঁহাকে জানিয়া নিজ অভিষ্ট লাভ করেন।

"যিনি আমাদিগকে জীবনদান করিয়াছেন, যিনি আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থান অবগত আছেন, তিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করেন বটে, কিন্তু তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সকলেই তাঁহাকে জানিতে বাঞ্ছা করে।"

ঋগ্বেদের আর একটী পবিত্র সূক্ত আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"আদিকালে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। জন্মাবধি তিনি সকলের ঈশ্বর। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন।

"হব্যদ্বারা কাহার পূজা করিব?

"যিনি জীবন ও বল দান করিয়াছেন, দেবগণ যাঁহার

আজ্ঞা পালন করেন, অমরত্ব যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার দাস,—তাঁহারই পূজা করিব।

"হব্যদ্বারা কাহার পূজা করিব?

"যিনি অসীম ক্ষমতাদ্বারা সমস্ত নয়নবিশিষ্ট ও গতি-বিশিষ্ট জীবিত পদার্থের সম্রাট, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের সম্রাট,—তাঁহারই পূজা করিব।

"হব্যদ্বারা কাহার পূজা করিব?

"যিনি অসীম ক্ষমতা দ্বারা তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সসাগরা ধরা সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার হাত এই বিস্তৃত দিঙ্মণ্ডল,—তাঁহারই পূজা করিব।

"হব্যদ্বারা কাহার পূজা করিব?

"যিনি আকাশ ও মেদিনী নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন, যিনি আকাশ পরিমাপ করিয়াছেন, তাঁহারই পূজা করিব।

"হব্যদ্বারা কাহার পূজা করিব?

"যিনি শব্দায়মান গগনমণ্ডল ও মেদিনী স্থিরীকৃত ও বিস্তৃত করিয়াছেন, যাঁহাকে আলোকপূর্ণ আকাশ ও পৃথিবী সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া পূজা করে, যাঁহার প্রভাবে সূর্য্যদেব উদয় হইয়া কিরণ প্রাপ্ত হয়,—তাঁহারই পূজা করিব।"

এইরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও প্রভাবের পূজা হইতে প্রাচীন ঋষিগণ ক্রমে সেই প্রকৃতির ঈশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কালের হিন্দু ধর্ম্ম যারপরনাই সরল ও মহৎ।

দেববিষয়ে যেরূপ, অন্যান্য বিষয়েও আদিম হিন্দুধর্ম্ম

আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম হইতে সেইরূপ পৃথক্‌। আদিম হিন্দু-দিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না; ধর্ম্মঘটিত অসমতা ছিল না। আরাধনাও সরল; উপাসক ঘৃত অথবা সোমরসের আহুতি দান করিতেন; নিজের অথবা পরিবারের কুশল বা স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন, গোবৎসবৃদ্ধির জন্য আরাধনা করিতেন, অথবা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজগৃহে পূজানির্ব্বাহার্থ এক এক জন করিয়া পুরোহিত নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। পূজকের গৃহই মন্দির, ইহা ভিন্ন অন্য মন্দির ছিল না, দেবমূর্ত্তিও ছিল না। প্রথম হিন্দুদিগের এইরূপ সরল ধর্ম্ম ও এইরূপ সরল পূজাপদ্ধতি ছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যদিও সর্ব্বসাধারণ লোকে নিজ নিজ গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া দেবগণকে সরল মনে আরাধনা করিত, তথাপি ধনাঢ্য ও রাজপুরুষদিগের গৃহে ঘটার সহিত যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহার্থ পুরোহিত নিযুক্ত হইতেন। সে কালের পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কেন না তৎকালে জাতি-গত অসমতা ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে যে লোক বা যে বংশ মন্ত্ররচনায় অথবা যজ্ঞকার্য্যসম্পাদনে অধিকতর নৈপুণ্য লাভ করিতেন তাঁহারাই পুরোহিত হইতে পারি-তেন। এইরূপে বশিষ্ঠবংশ ও বিশ্বামিত্রবংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনাকরিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সময়ে একটি গল্প সৃষ্ট হইয়াছে যে বশিষ্ঠবংশীয়েরা ব্রাহ্মণ এবং বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয়ছিলেন,

পরে ব্রাহ্মণ হয়েন ; কিন্তু এ সকল অলীক কথা। ঋগ্বেদ রচনার সময় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া জাতি ছিল না। বশিষ্ঠ বা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা প্রাচীন ঋষি ছিলেন, অনেক ভূসম্পত্তি ও গোমহিষাদি অধিকার করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন, রাজাদিগের যজ্ঞ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতেন, আবার যুদ্ধের সময় আর্য্য নাম ও আর্য্য অধিকার রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিতেন। প্রাচীন ঋষিগণ অরণ্যে বাস করিয়া ফল মূল আহার ও ধ্যান ধারণা করিয়া বৃথা জীবন অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহারা সমাজে থাকিয়া সমাজের উপকার সাধন করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে হিন্দুরাজ্য বিস্তার।

অনুমান ১৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০
পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

কুরু ও পঞ্চাল জাতি। হিন্দুগণ সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। অচিরে শতদ্রুনদী পার হইয়া তাঁহারা যমুনা ও গঙ্গার উপকূলে

অধিনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। যে সকল হিন্দুজাতি গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কুরু ও পঞ্চাল জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য এবং পরাক্রান্ত ছিলেন।

প্রাচীন ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই দুই পরাক্রান্ত জাতি পূর্ব্বে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। ক্রমে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গা-তীরস্থ উর্ব্বর প্রদেশে গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ এবং তথাকার অরণ্যাদি দগ্ধ করিয়া ভূমি আবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুমান ১৪০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত হইল। যে স্থানে আধুনিক দিল্লী নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই চতুর্দ্দিগস্থ প্রদেশ খণ্ডে প্রাচীন কুরুরাজ্য এবং যে স্থানে আধুনিক কান্যকুব্জ নগর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারই চতুর্দ্দিগস্থ প্রদেশখণ্ডে প্রাচীন পঞ্চাল রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

সেই প্রাচীন কালের গ্রন্থ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সমূহ হইতে উপলব্ধি হয় যে, কুরু ও পঞ্চালগণ বহুকালপর্য্যন্ত পরস্পর মিত্রভাবে নিজ নিজ প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে এই দুই জাতির মধ্যে একটি ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া উভয় পক্ষের বহুসংখ্য লোক নিহত হয়। সে যুদ্ধ অনুমান ১২৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। তাহার ঐতিহাসিক কোন বিবরণ এক্ষণে পাওয়া যায় না।

ঐ যুদ্ধের কথা অবলম্বন করিয়া আধুনিক মহাভারত নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে,—কিন্তু মহাভারতে যে বিবরণ

পাওয়া যায়, তাহার অতি অল্প অংশই ঐতিহাসিক, অধিকাংশই কাল্পনিক। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি যে বীরগণের কথা মহাভারতে আছে, তাঁহারা কাল্পনিক মাত্র। তাঁহাদিগের নাম প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দ্রৌপদীর কথা সমস্তই কাল্পনিক,—হিন্দুরমণী কখনও বহুস্বামী বিবাহ করিতেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে বিবরণ আছে, তাহাও সমস্ত কাল্পনিক,—প্রকৃত যে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না।

যে কবি কুরুপঞ্চালদিগের ঐতিহাসিক যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মহাভারতের কাল্পনিক গল্প রচনা করিয়াছেন তিনি প্রকৃত ইতিহাস না লিখিলেও কবিত্বের জন্য আমাদিগের পরম কৃতজ্ঞতার ভাজন। মহাভারতের সমতুল্য কাব্য ভারতবর্ষে কিম্বা সমস্ত জগতে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ভীষণ অভিমানী দুর্য্যোধন, ক্রুদ্ধ, গর্ব্বিত, তেজঃপূর্ণ কর্ণ, প্রশান্তমূর্ত্তি, প্রশান্তহৃদয়, ভক্তিভাজন, জগতে অতুল্য বীর ভীষ্ম, অসাধারণ তেজস্বী যুদ্ধাচার্য্য দ্রোণ, চতুর রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ, চতুর অস্ত্রজ্ঞ অর্জ্জুন, শান্ত ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, পরাক্রান্ত সবল স্বভাব ভীম;—এক একটি চিত্র এক একটি রত্ন;—মনুষ্যকল্পনাসাগর হইতে এরূপ রত্ন আর কখনও উদ্ধৃত হয় নাই।

কোশল, বিদেহ ও কাশী জাতি। গঙ্গা নদীর উপকূলে আসিয়াও হিন্দুগণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আরও পূর্ব্বদিগে গমন করিতে লাগিলেন, বহুসংখ্য নদ নদী পার হইয়া নূতন নূতন প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া রাজ্য-স্থাপন করিতে লাগিলেন। গোগরা, গোমতী,

গণ্ডক প্রভৃতি নদী পার হইয়া, ঐ সকল নদীতীরস্থ অরণ্য দগ্ধ করিয়া, কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিতে লাগিলেন, এবং যে স্থানে কেবল বন্য পশু ও বন্য মনুষ্যের আবাস ছিল, তথায় সুসভ্য মনুষ্যের বাসোপযোগী গ্রাম ও নগর সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গঙ্গার পূর্ব্বদিগে তিনটি পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আধুনিক অযোধ্যাদেশ ব্যাপিয়া, অর্থাৎ গঙ্গা ও গণ্ডকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, প্রাচীন কোশল-দিগের বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপিত হইল। এবং আধুনিক মিথিলা প্রদেশ ব্যাপিয়া, অর্থাৎ গণ্ডকের পূর্ব্বতীরে, প্রাচীন বিদেহদিগের বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপিত হইল। দক্ষিণে আধুনিক বারাণসী নগরের চতুর্দ্দিগস্থ প্রদেশখণ্ডে প্রাচীন কাশী-দিগের একটি রাজ্য সংস্থাপিত হইল। অনুমান ১২০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যত্রয় মহা পরাক্রান্ত হইয়া উঠে।

এই তিন জাতির সম্রাটদিগের মধ্যে বিদেহ দেশের অধিপতি রাজর্ষি জনক শাস্ত্রালোচনার জন্য অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। কাশীদেশের রাজা অজাতশত্রুও অতিশয় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন "আমার রাজ্যে পণ্ডিতগণ থাকেন না, সকলেই জনক রাজার সভায় প্রস্থান করেন।" জনকরাজার সভার প্রধান পুরোহিতের নাম যাজ্ঞবল্ক্য। বেদ সমূহের মধ্যে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে যজ্ঞপদ্ধতি ও নিয়মাদি সঙ্কলিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য সেই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ভাঙ্গিয়া শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রচার করিলেন এবং শতপথব্রাহ্মণ নামক একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থেরও সূত্রপাত করিয়া গেলেন।

পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, স্বয়ং সম্রাট

জনক তদপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। পুরোহিত যজ্ঞের পদ্ধতি ও নিয়মের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, রাজা তদপেক্ষা উচ্চ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। পরব্রহ্ম, আত্মা, প্রাণিসৃষ্টি, ভাবিজগৎ, এই সকল মহৎ বিষয় লইয়া তৎসময়-রচিত উপনিষৎসমূহে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখা যায়, তাহা জনক রাজা এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজার প্রবর্ত্তিত। যাগযজ্ঞরত ব্রাহ্মণগণ এই সমস্ত নূতন বৈজ্ঞানিক আলোচনা শিক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয় রাজাদিগের নিকট আসিতেন, উপনিষৎসমূহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরে জনকরাজার যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহা ঐতিহাসিক, কেন না ঐ বিবরণ জনক রাজার সময়ে রচিত গ্রন্থাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আধুনিক রামায়ণ গ্রন্থে বিদেহাধিপতি জনক রাজা ও কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা সমস্তই কাল্পনিক, ইতিহাসমূলক নহে। জনকের জামাতা দাক্ষিণাত্য বা সিংহল দ্বীপ জয় করেন নাই, সেকালে হিন্দুগণ সিংহল দ্বীপের অস্তিত্বই জানিতেন না। সীতা জনকের দুহিতা ছিলেন না। সীতা সিন্ধুতীরস্থ প্রথম হিন্দুদিগের সময় হইতে একজন আরাধ্যা দেবী। লাঙ্গল কর্ষণ করিলে মৃত্তিকায় যে রেখা অঙ্কিত হয়, প্রাচীন হিন্দুগণ তাহাকেই সীতা বলিয়া পূজা করিতেন। ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা, অতএব শস্যদাতা, সুতরাং প্রাচীন হিন্দুগণ ইন্দ্রকেই সীতার পতি বলিয়া আরাধনা করিতেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে যখন দাক্ষিণাত্য ও সিংহল-দ্বীপ হিন্দুদিগের পরিচিত হইল, যখন দাক্ষিণাত্যের বন

পরিষ্কৃত হইয়া উর্ব্বরাক্ষেত্র সমুদায় লাঙ্গলফলাদ্বারা অঙ্কি হইল, তখন সীতা, অর্থাৎ লাঙ্গলরেখা দক্ষিণাপথে অ হইয়া আসিয়াছে, কবিগণ এইরূপ কল্পনা করিলেন। সে সীতা কাহার কন্যা? কাহার বনিতা? কবিগণ কল্পনা করিলেন যে শাস্ত্রালোচনায় অদ্বিতীয় বিদেহাধিপতিই সীতার জনক হইবেন,—ক্ষমতায় অদ্বিতীয় কোশলাধিপতিই সীতার পতি হইবেন। এইরূপে রামায়ণ গ্রন্থের উৎপত্তি হইল। কিন্তু যদিও রামায়ণ গ্রন্থ ঐতিহাসিক নহে—তথাপি এই কাব্যের রচয়িতা আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। রামায়ণ গ্রন্থ মহাভারতের সমকক্ষ না হইলেও, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য তাহার সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ শোকার্ত্ত দশরথের চিত্র, পতিপরায়ণা সীতার জীবনব্যাপী শোক, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সত্যপ্রিয়তা ও বীরত্ব, এই সমস্ত অপূর্ব্ব চিত্র গুলি হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়কন্দরে চিরকাল গ্রথিত থাকিবে।

জাতিগত বৈষম্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দুগণ যখন সিন্ধুতীরে প্রথমে রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তার করেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতা ছিল না। কেবল বিজয়ী হিন্দুগণ আর্য্যবর্ণ, পরাজিত বন্যগণ অনার্য্য বা দাসবর্ণ, এই মাত্র বিভিন্নতা ছিল। পরে যখন হিন্দুগণ গঙ্গার উপকূলে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, যখন যমুনার তীর হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশগুও হিন্দুরাজ্যে আচ্ছাদিত হইল তখন ব্যবসায়গত বিভিন্নতা, ক্রমে বংশানুগত হইয়া জাতি বলিয়া পরিণত হইল। পূর্ব্বে যাহারা

পুরোহিত ছিলেন, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে পুরোহিতের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা একণে ব্রাহ্মণ বলিয়া একটি ভিন্ন জাতির অন্তর্গত হইলেন। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা এক্ষণে ক্ষত্রিয় বলিয়া একটি ভিন্ন জাতির অন্তর্গত হইলেন; এবং নগরবাসী ও গ্রামবাসী লোকসমূহ, যাহারা শিল্প বা কারুকার্য্য অথবা কৃষি ও মেষপালনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা বৈশ্য নামে এক জাতির অন্তর্গত হইলেন। বিজিত অনার্য্যগণ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

এই প্রাচীন কালের জাতি-পদ্ধতির সহিত আধুনিক জাতি-পদ্ধতির তুলনা করিলে অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সে সময়ে জনসাধারণের মধ্যে কোন জাতিগত বিভিন্নতা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন লোক কৃষি বা মেষপালন, শিল্প বা কায়িক পরিশ্রম অবলম্বন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই বৈশ্য ছিলেন, ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বীদিগের মধ্যে আহারাদির চলন ছিল, বিবাহ হইতে পারিত, জাতিগত ঐক্য ছিল। এক্ষণে সেই বৈশ্যজাতি ভাঙ্গিয়া কায়স্থ, বৈদ্য, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, বণিক্, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি নানা জাতি সংগঠিত হইয়াছে, এক একটি ব্যবসা এক একটি জাতি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিবাহ হইতে পারে না, আহারাদি নাই, সামাজিক একতাও নাই। এইরূপে জাতীয় একতা হীন হইয়াছে, জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে হিন্দু জাতির অবনতি হইয়াছে।

আবার প্রাচীন কালে শূদ্রভিন্ন সকল জাতিরই শাস্ত্র অধিকার ছিল, সকল জাতিই উপবীত ধারণ করিত, সকল জাতিই বেদ অধ্যয়ন করিত, সকল জাতিই অগ্নিতে আহুতি দিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিত। এক্ষণে সেরূপ নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লোপ হওয়াতে ক্ষত্রিয়দিগের পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য নাই। বৈশ্যগণও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক্, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন, উপবীতধারণ, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞসম্পাদন প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে এক্ষণে আর কাহারও অধিকার নাই। ইহার ফল বিষময় যে দেশে সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনে অধিকার না থাকে, যে দেশে পুরোহিতগণ শাস্ত্রানুশীলন একচাটিয়া করেন, সে দেশের অবনতি ও পতন অনিবার্য্য।

প্রাচীন জাতিপদ্ধতি ও আধুনিক জাতিপদ্ধতির মধ্যে আরও অনেকগুলি বৈষম্য আছে। পূর্ব্বকালে এক জাতির পুরুষ নিম্নজাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন, এক জাতির লোক অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং শূদ্র ভিন্ন সমস্ত হিন্দুজাতি শিক্ষিত, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, ও সম্মানিত ছিলেন। ভারতবর্ষে স্বাধীনতালোপের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত উদার নিয়ম গুলি বিলুপ্ত হইয়াছে।

আচারব্যবহার ও সভ্যতা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গঙ্গাতীরবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে বিদ্যা ও শাস্ত্রের অতিশয় আদর ছিল। এবং সম্রাট্‌গণ নিজ নিজ সভায় বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া

তাহাদিগের সহিত শাস্ত্রানুশীলন করিতে ভাল বাসিতেন; কিন্তু কেবল রাজসভায় বিদ্যার আলোচনা হইত এমন নহে। নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামেও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ছাত্রগণকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তথাকার শিক্ষাপ্রণালী অনেকটা এখনকার টোলের ন্যায় ছিল। পিতা পুত্রকে গুরুহস্তে অর্পণ করিতেন, বালক গুরুর গৃহে বাস করিত, গুরু ও গুরুপত্নীকে পিতা মাতার ন্যায় সেবা করিত, গৃহকার্য্য সম্পাদন করিত, ভিক্ষা করিয়া অন্ন আহরণ করিত, এবং দিন দিন বিদ্যা উপার্জ্জন করিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিশুগণ এইরূপে বেদাধ্যয়ন ও বিদ্যাউপার্জ্জনকরিয়া দ্বাদশ বা তদধিক বৎসর পর গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

গ্রামে গ্রামে এইরূপে গুরুগণ বালকদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। এতদ্ভিন্ন কুরু, পঞ্চাল, বিদেহ, কাশী, কোশল ও অন্যান্য জাতিদিগের রাজধানী ও বড় বড় নগরে পরিষদ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এক একটি পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন এবং অনেক বালক প্রথমে গুরুদিগের নিকট কথঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করিয়া তৎপরে পরিষদে প্রবেশ করিত।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে যুবা বিবাহ করিত এবং তদবধি গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিত। যজ্ঞ অনেক প্রকার ছিল। বড় বড় যজ্ঞে পুরোহিতদিগকে আহ্বান করা হইত, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যজ্ঞগুলি গৃহস্থ নিজেই সম্পাদন করিতেন। তদ্রূ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-

মাত্রেই নিজে নিজে এইরূপ যজ্ঞগুলি সম্পাদন করিত, এবং পবিত্র যজ্ঞাগ্নি চিরকাল গৃহে প্রজ্জলিত রাখিত।

এইরূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যজ্ঞ ব্যতীত অনেকগুলি সাংসারিক অনুষ্ঠান ছিল, তাহাতে হিন্দুগণ চিরকালই রত। গর্ভাধান, পুত্রের নামকরণ, চূড়াকরণ উপনয়ন প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যে হিন্দুগণ আমোদ আহ্লাদ করিত।

মনুষ্য পরলোক গমন করিলে তাহার শরীর দাহ করিয়া মৃত্তিকায় তাহার ভস্ম সঞ্চয় করা হইত এবং মৃতের জন্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদিত হইত।

সিন্ধুতীরবাসী আদিম হিন্দুদিগের অপেক্ষা গঙ্গাতীরবাসী হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শাসনপ্রণালী এবং বিচারপ্রণালী অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, প্রজাসমূহ অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়াছিল, শিল্প ও কারুকার্য্য ও সভ্যসমাজের প্রয়োজনায় সকলপ্রকার দ্রব্যাদি অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সম্রাট্‌গণ বিস্তীর্ণ প্রাসাদে বহুসেনাবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন, প্রজাগণ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে সুরম্য হর্ম্ম নিৰ্ম্মাণ করিত, বণিকগণ সুন্দর শিল্পজাত দ্রব্যাদি লইয়া দেশহইতে দেশান্তর ভ্রমণ করিত, এবং কৃষকগণ রাজকর প্রদান করিয়া সচ্ছন্দে কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবন যাপন করিত। রাজাদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইলেও কোনও রাজা কৃষকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন না।

ফলতঃ এই কালের হিন্দুগণ কতদূর সভ্যতালাভ করিয়া-

ছিলেন তাহা আমরা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে কুরু ও কোশলদিগের বর্ণনা পাঠে কতকদূর অনুভব করিতে পারি।

জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র। গঙ্গাতীরবাসী হিন্দুগণ বিদ্যার বিশেষ আলোচনা করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত বিজ্ঞানই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রও এইরূপ। নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্য্যের গতি দেখিয়া যজ্ঞকার্য্যের সময় নির্দ্ধারিত হইত, সুতরাং হিন্দুগণ অচিরে নক্ষত্রাদি দর্শনে পারদর্শী হইলেন। আকাশের যে পথ দিয়া চন্দ্র ভ্রমণ করে সেই পথটি সপ্তবিংশ অংশে বিভক্ত করা হইল, এবং প্রত্যেক অংশে যে যে নক্ষত্রসমূহ দৃষ্টহয় তাহাদিগের অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা রোহিণী প্রভৃতি ২৭ টি নাম দেওয়া হইল। আবার এই সমস্ত নাম হইতে বৎসরের দ্বাদশ মাসের নাম দেওয়া হইল যথা,—অশ্বিনী হইতে আশ্বিন মাস, কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক মাস ইত্যাদি। সূর্য্যের উত্তরায়ন গতি ও দক্ষিণায়ন গতি নির্দ্ধারিত হইল, এবং যে দিবসে সূর্য্য উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে, এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমনকরে তাহাও স্থিরীকৃত হইল। চান্দ্র-বৎসর অর্থাৎ দ্বাদশ পূর্ণিমা গণনা করিলে যত দিন হয় তাহা স্থিরীকৃত হইল, এবং তাহার সহিত সৌর-বৎসরের যে বিভিন্নতা আছে তাহারও সামঞ্জস্য করিবার উপায় উদ্ভাবন করা হইল। এইরূপে জ্যোতিষ শাস্ত্র ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের ২৭টি নক্ষত্র হইতে প্রাচীন চীন ও আরবগণ নক্ষত্র গণনা করিতে শিক্ষা লাভ করিল।

ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে যেরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি, সেই-রূপ ব্যাকরণ, জ্যামিতি ও অন্যান্য শাস্ত্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে। যজ্ঞকার্য্যে বেদের মন্ত্রগুলি অভ্রান্তরূপে উচ্চারণকরা আবশ্যক, সুতরাং শব্দের উচ্চারণের নিয়মাবলি নির্দ্ধারিত হইল, ধাতু, বিভক্তি ও প্রত্যয় নির্দ্ধারিত হইল এবং এইরূপে ব্যাকরণ শাস্ত্র গঠিত হইল। আবার যজ্ঞের বেদি নির্ম্মাণ করিবার অনেকগুলি নিয়ম স্থিরীকৃত হইল; কোন বেদি ত্রিকোণ, কোন বেদি চতুষ্কোণ, অন্যান্য বেদি অন্যান্য আকার বিশিষ্ট ছিল। কিরূপে ত্রিকোণের কালি ঠিক রাখিয়া চতুষ্কোণ নির্ম্মাণ করিতে হয়, কিরূপে চতুষ্কোণের কালি ঠিক রাখিয়া গোলাকার নির্ম্মাণ করিতে হয়, এই সকল নিয়ম হইতে জ্যামিতিশাস্ত্র উৎপন্ন হইল। প্রাচীন গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে জ্যামিতির প্রথমনিয়মাবলি শিক্ষা করিয়া ঐ শাস্ত্রের আরও উন্নতি সাধন করেন।

অঙ্কবিদ্যায়ও প্রাচীন হিন্দুগণ অদ্বিতীয় ছিলেন। ফলতঃ তাঁহারা যে দশমিক গণনা উদ্ভাবন করিয়াছেন, কালক্রমে সমুদায় সভ্যজগতে তাহাই প্রচলিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রণালী। সিন্ধুতীরস্থ আদিম হিন্দুগণ যেপ্রাকৃতিক দেব দেবীর আরাধনা করিতেন, গঙ্গাতীরস্থ হিন্দুগণও সেই দেব দেবীর উপাসনা করিতেন। ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, মিত্র, সোম, উষা, সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবী কুরু, পঞ্চাল, কোশল, বিদেহ এবং কাশীদিগের আরাধ্য ছিলেন; কিন্তু ক্রমে যজ্ঞকার্য্যের আড়ম্বর অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। নানারূপ যজ্ঞের নানারূপ নিয়মাবলি ও পদ্ধতি লইয়া গঙ্গা

তীরবাসী হিন্দুগণ অধিক ব্যস্ত হইলেন। কোন্ যজ্ঞে কি কি ক্রিয়া করিতে হয়, কোন্ ক্রিয়ার কি অর্থ, কি কারণ, এবং কি ফল, পুরোহিতগণ এ বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য "ব্রাহ্মণ" নামক বহুসংখ্য দীর্ঘ পুস্তক রচনা করিতে লাগিলেন। আবার গৃহস্থদিগের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ ভিন্ন অরণ্যবাসী ঋষিদিগের যে সমস্ত ক্রিয়া প্রয়োজনীয় তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া "আরণ্যক" নামে অনেক গ্রন্থ রচিত হইল।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে পুরোহিতগণ যে সময়ে এই সমস্ত ক্রিয়া কলাপ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রকৃত ধর্ম্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা যে গভীর আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, "উপনিষৎ" নামক গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সে আলোচনার সার মর্ম্ম এই যে, এই অনন্ত বিশ্ব কেবল ব্রহ্ম। অর্থাৎ পরমেশ্বরের অংশমাত্র, ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, পুনরায় সেই ব্রহ্মায় লয় প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্য ও সমস্ত জীব জন্তু এবং উদ্ভিদাদি অচেতন পদার্থ বার বার জন্ম গ্রহণ করিয়া অবশেষে পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই এক ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। উপনিষদের এই কথাই হিন্দু ধর্ম্মের সার মর্ম্ম, জগদ্ব্যাপী একমাত্র জগদীশ্বরই হিন্দুবিশ্বাসের মূল মর্ম্ম। তাহার উপর যে সমস্ত দেব দেবীর নানা উপন্যাস কথা সংযোজিত হইয়াছে, উহা কেবল শিক্ষিত লোকদিগের প্রলোভনের জন্য। এ সকল উপন্যাস কথা একেশ্বরমূলক, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মকে স্পর্শ করে না।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে এই পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আর একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"যিনি বিজ্ঞ, যাঁহার অবয়ব আত্মারস্বরূপ যাঁহার আকৃতি আলোকস্বরূপ, যাঁহার চিন্তা সত্যস্বরূপ, যাঁহার প্রকৃতি আকাশরূপ সর্ব্বব্যাপী এবং দৃষ্টির অগোচর, যাঁহাহইতে কর্ম্ম সমূহ, বাসনাসমূহ, গন্ধ ও আস্বাদনসমূহ নির্গত হয়, যিনি এ সমস্ত ধারণ করেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ করেন না, বিস্ম ভাব জানেন না।

"তিনিই আমার অন্তরাত্মা, তণ্ডুল হইতেও ক্ষুদ্র, য হইতেও ক্ষুদ্র, সর্ষপ হইতেও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বীজের অন্তরাং হইতেও ক্ষুদ্র। তিনিই আমার অন্তরাত্মা, পৃথিবী হইতে মহৎ, আকাশ হইতেও মহৎ স্বর্গ হইতেও মহৎ, সমস্ত বি ব্রহ্মাণ্ড হইতেও মহৎ।

"যাঁহা হইতে কর্ম্মসমূহ, বাসনাসমূহ, গন্ধ ও আস্বাদ সমূহ নির্গত হয়, যিনি এ সমস্ত ধারণ করেন, যিনি বা উচ্চারণ করেন না, বিস্ময়ভাব জানেন না, তিনিই আমা অন্তরাত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম। যখন আমি এ জগৎ হই গমন করিব, তখন আমি তাঁহাকে পাইব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মগধরাজ্যের প্রাধান্য।

অনুমান ১০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৬০

পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য বিস্তার। হিন্দুগণ ক্রমে কাশী ও মিথিলা প্রদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। তাঁহারা মিথিলা প্রদেশের দক্ষিণে গঙ্গানদী, গঙ্গানদীর দক্ষিণে মগধপ্রদেশেও বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে মগধপ্রদেশ অনার্য্য বর্ব্বরদিগের বাসস্থান ছিল, কিন্তু ক্রমে হিন্দুগণ সেই প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সভ্যতা প্রচার করিতে লাগিলেন। অচিরে সমস্ত মগধপ্রদেশ হিন্দু শিক্ষায় শিক্ষিত হইল, এবং কালক্রমে মগধরাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল।

আবার বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া হিন্দুগণ ক্রমে দক্ষিণাপথে বিস্তৃত হইতে লাগিলেন। জনক রাজার সময়ে যে দাক্ষিণাত্য দণ্ডকারণ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, তথায় অন্ধ্রজাতির একটি সভ্য মহাপরাক্রান্ত রাজ্য গঠিত হইল। ফলতঃ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অন্ধ্র রাজ্যের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজ্য সে সময়ে আর ছিল না। অন্ধ্রগণ নর্ম্মদা নদীর তীর হইতে কৃষ্ণা

নদীর তীর পর্য্যন্ত আপনাদিগের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তার করিলেন।

পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে হিন্দু সভ্যতা প্রচারিত হইল; পূর্ব্বদিকে গঙ্গার মোহনা হইতে আধুনিক মাদ্রাজ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ কলিঙ্গরাজ্য সমুদ্রের উপকূলে সংস্থাপিত হইল; এবং ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণ সীমায় দ্রাবিড়জাতিগণ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা গ্রহণ করিয়া চোল, চের ও পাণ্ড্য নামক তিনটি রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। কালক্রমে সিংহলদ্বীপ আবিষ্কৃত হইল এবং তথায়ও হিন্দু সভ্যতা প্রচারিত হইল। এইরূপে ১০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে অনুমান ৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা প্রচারিত হইল,—সকল দেশেই হিন্দুগন প্রবেশ করিলেন এবং সকল দেশের অনার্য্যজাতিগনও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

মগধ রাজ্যের প্রাধান্য। এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন নূতন হিন্দুরাজ্য গঠিত হইল; কিন্তু এই সমস্ত নূতন হিন্দু রাজ্যের মধ্যে মগধরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। কোন্ সময়ে মগধরাজ্য প্রথমে সভ্যতা ও ক্ষমতা লাভ করে তাহা নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে, যখন গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই মগধ প্রদেশ একটি সুসভ্য হিন্দুরাজ্য হইয়াছিল।

৫৩৭ খৃঃ অব্দ হইতে ৪৮৫ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিম্বিসার নামক পরাক্রান্ত রাজা মগধ ও অঙ্গপ্রদেশে রাজত্ব করেন।

তাহারই সময়ে গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ হইতে আমরা সেই সময়ের মগধবাসীদিগের সভ্যতার পরিচয় পাই। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক [illegible]৮৫ হইতে ৪৫৩ পূঃ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে গৌতমবুদ্ধের স্বর্গলাভ হয়। অজাতশত্রু অতি ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন। সে সময়ে তুরাণীয় জাতীয় শকগণ হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রমকরিয়া প্রাচীন বিদেহদিগের দেশে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। অজাতশত্রু তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ বিদেশীয় জাতির অধিকার হইতে মুক্ত করেন। পশ্চিমদিকেও অজাতশত্রু প্রাচীন কোশল, কাশী প্রভৃতি রাজ্য জয়করিয়া মগধ রাজ্যের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। যে সকল প্রাচীন বিদেহ, কোশল ও কাশিগণ বহুকাল অবধি শাস্ত্রানুশীলন করিয়া হিন্দুসভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাঁহারা নূতন মগধ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কোনও প্রদেশের সমৃদ্ধি স্থায়ী নহে ; হিন্দুরাজলক্ষ্মী প্রথমে সিন্ধু-উপকূলে, তৎপরে গঙ্গা ও যমুনা-উপকূলে এবং অবশেষে মগধরাজ্যে আপনার কৃপা বর্ষণ করিলেন।

অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর অনুমান ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত কতিপয় রাজা রাজত্ব করেন, তাহার পর ৩৭০ হইতে ৩২০ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নয় জন নন্দ মগধদেশ শাসন করেন। শেষ নন্দের সময় মাসিডনের অধিপতি মহাবলপরাক্রান্ত আলেকজণ্ডর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ; কিন্তু শতদ্রু নদীর তীর

পর্য্যন্ত জয় করিয়া তিনি স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মগধ প্রদেশ হইতে চন্দ্রগুপ্ত নামক একজন পলাতক আলেকজণ্ডরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতিপয় দিবস তাঁহার শিবিরে বাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্তের ধৃষ্টতায় আলেকজণ্ডর অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবির হইতে পলায়ন করেন।

আলেকজণ্ডর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে পর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব প্রদেশীয় যোদ্ধাদিগের সহায়তায় এবং চাণক্য পণ্ডিত নামক বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণের সাহায্যে শেষনন্দকে পরাস্ত করিয়া অনুমান ৩২০ পূঃ খৃষ্টাব্দে মগধ রাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। মগধপ্রদেশে অনেক পরাক্রান্ত রাজা হইলেও চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজা কেহ ছিলেন না। তিনি প্রাচীন কুরু, পঞ্চাল ও সিন্ধুবাসী হিন্দুদিগের অধিকৃতপ্রদেশ সকল জয়করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীকপণ্ডিত মেগাস্থিনিস মগধদেশের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে চন্দ্রগুপ্তের অসীম ক্ষমতা এবং হিন্দুদিগের উন্নত সভ্যতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদিগের শাসনপ্রণালী, শাস্ত্রালোচনা, শিল্প ও কারুকার্য্য, যুদ্ধ নিয়ম ও সমাজনিয়ম, শান্তপ্রকৃতি, এবং সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

অনুমান ২৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র বিন্দুসার মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। বিন্দুসারের পর

তদীয় পুত্র অসীম গৌরবান্বিত অশোকরাজ অনুমান ২৬০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মগধের সম্রাট্ হয়েন। দীন দরিদ্র গৌতমবুদ্ধ, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ভারতেশ্বর অশোকরাজ স্বয়ং সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করিলেন। সুতরাং অশোক রাজার সময় হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ কালের আরম্ভ হইল। সেই বৌদ্ধ কালের বিবরণ পর পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

গ্রীকলিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ। গ্রীক পণ্ডিতগণ তৎকালের হিন্দু সমাজের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক।

গ্রীকগণ সাতটি জাতির কথা লিখিয়াছেন। যথা—

(১) ধর্ম্ম ও বিদ্যা ব্যবসায়ী।

(২) রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারী।

(৩) চর বা দূত।

(৪) যোদ্ধা।

(৫) গোমেষ রক্ষক।

(৬) কৃষক।

(৭) নানা-শিল্প-ব্যবসায়ী লোক।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উপরি উক্ত সাতটী জাতি শাস্ত্র বর্ণিত চারি জাতির রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম ও বিদ্যাব্যবসায়ী, রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারিগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ নহে; তবে কতক ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও বিদ্যা অনুশীলন করিতেন, কেহ কেহ রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন; সুতরাং বিদেশীয় দর্শক ভ্রমক্রমে দুই সম্প্রদায়কে দুই জাতি বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। যোদ্ধৃগণ ক্ষত্রিয়। গোমেষরক্ষক, কৃষক ও শিল্পব্যবসায়িগণ বৈশ্য ও শূদ্র হইবে। গুপ্তচর ও দূত-দিগকে গ্রীকগণ ভ্রমক্রমে একটি ভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরি উক্ত গ্রীক-বিবরণে দাসের নামোল্লেখ মাত্র নাই, বরং আরীয়ান স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারত-বর্ষে দাস নাই, সকলেই স্বাধীন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিন শতাব্দী পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে শূদ্রগণ আর দাস ছিল না তাহারা নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত।

বিদ্যা ও ধর্ম্মব্যবসায়ী (অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ) সকল জাতি অপেক্ষা সম্মানিত ও সকল রাজকর হইতে মুক্ত; কেবল উপাসনা দ্বারা রাজ্যের সহায়তা করিতেন। বনে বাস এবং তৃণশয্যায় বা পশুচর্ম্মে শয়ন করিয়া, অল্পাহারী হইয়া, তাঁহারা বহু পরিশ্রমে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। সপ্তত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত হইত। যাগ-যজ্ঞে ও পূজাকর্ম্মে তাঁহাদিগের অবিভক্ত অধিকার ছিল।

তাঁহারা কখন কখন এক একটি গ্রাম অধিকার করি-তেন এবং বিপদের সময় সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতেন। রাজকার্য্যে সর্ব্বদাই তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন।

গ্রীকগণ কঠোর তপস্যার অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন আলেকজণ্ডরের একজন অনুচর তাঁহার আজ্ঞানুসারে কয়েক জন তাপসকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন, নগর হইতে এক ক্রোশ দূরে পনর জন তাপস উলঙ্গ হইয়া, রৌদ্রের উত্তাপে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। কেহ দণ্ডায়মান

হইয়া, কেহ উপবেশন করিয়া, কেহ শয়ন করিয়া আছেন; কিন্তু সকলেই প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিলেন। অন্যান্য গ্রীকগণ অন্যান্য তাপসগণকে দেখিয়াছিল। যখন তাপসগণ নগরের ভিতরে আসিতেন, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক দোকান হইতে ফল মূল লইয়া আহার করিতেন, তৈল লইয়া শরীর সিক্ত করিতেন, ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া একত্র আহার করিতেন, যে স্থানে যাইতেন, সেই স্থানেই সম্মানিত হইতেন. কেহ কেহ শীতে ও গ্রীষ্মে উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন ও বটবৃক্ষতলে রজনী অতিবাহন করিতেন।

সে সময়ে ভারতবর্ষে অনুমান একশত আঠারটি রাজ্য ছিল; সুতরাং অনেকগুলি রাজ্য যে ক্ষুদ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে যেরূপ, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ ক্ষেত্র-বেষ্টিত গ্রাম দ্বারা ভারতবর্ষ আচ্ছাদিত ছিল। সে সময়ে গ্রামস্থ লোক নিজ নিজ গ্রামের সমস্ত ব্যাপার নিজে নিজে নিষ্পন্ন করিত ও বিপদের সময় সমস্ত গ্রামবাসীলোক একত্র হইয়া, যেরূপ অপরিসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া গ্রাম রক্ষা করিত, তাহা দেখিয়া গ্রীকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের সৈন্যসংখ্যা অনেক ছিল। পুরু নামক যে সামান্য হিন্দুরাজা আলেকজণ্ডরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুইশত হস্তী, তিনশত রথী, চারিহাজার অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার পদাতিক ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধশিবিরে চারি লক্ষ লোক ছিল, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। সৈন্যগণ সকলেই ক্ষত্রিয় এবং রাজার নিকট কি যুদ্ধ, কি

শান্তি সকল সময়েই বেতন পাইত। সকল সৈন্যের ভূ... থাকিত। সৈন্যগণ কখনও দেশের অনিষ্ট করিত না; দু... পক্ষে মহাযুদ্ধ হইতেছে, এরূপ সময়েও নিকটস্থ কৃষকগ... নির্ভয়ে কৃষিকার্য্য করিত।

সমস্ত এসিয়াতে যত শত্রুর সহিত আলেকজণ্ডর যু... করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হিন্দুগণ সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, এ ক... গ্রীকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সৈন্যগণ হস্ত ও প... দ্বারা দীর্ঘ ধনু ব্যবহার করিত এবং চারিহস্ত দীর্ঘ তীর নিক্ষেপ করিতে পারিত, এতদ্ভিন্ন তাহারা দীর্ঘ খড়্গ ও লৌহ... বর্শা ব্যবহার করিত।

দেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। হইদাসপী... ও হাইপেসিস্ (সিন্ধু নদের দুইটি শাখা) নদীর মধ্যে ১৫০০ নগর ছিল, তাহার মধ্যে কোনটিও এক ক্রোশের অনধি... ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র দৈর্ঘে চারিক্রো... ও প্রস্থে প্রায় এক ক্রোশ পরিমাণ ছিল; তাহার চারিদিকে উন্নত স্তূপ (tower) এবং ৬৪ টি দ্বার ছিল। অনেক বন্দর, গভীর গড়খাই এবং উন্নত প্রাচীর ছিল; সে প্রাচীরে ৫৭০টি বাণিজ্যস্থান ছিল এবং বাণিজ্য উন্নতিশীল ছিল।

স্বয়ং রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বিচার কার্য্য নির্ব্বা... করিতেন। কৃষক, শ্রমজীবী ও বণিক্, এই তিন শ্রেণী হইতে কর আদায় হইত। ভূমির উৎপন্নের চতুর্থাংশের একাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। গ্রামের মণ্ডল বা রাজকর্ম্মচারিগণ ভূমি পরিমাপ করিতেন, ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল বিতরণ করিতেন, গ্রামস্থ লোকদিগের মধ্যে বিচার করিতেন, সকল প্রজা

গ্রীকগণ আরও বলেন, কোনও হিন্দু কখনও মিথ্যা কথা কহিতেন না।

নানা শাস্ত্রানুশীলন। পূর্ব্বকালে কুরু-পঞ্চাল ও কোশল বিদেহদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল, মগধ প্রাধান্যের সময়ের হিন্দুদিগেরও সেই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহারাও ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগকে পূজা করিতেন, পুরোহিত ডাকাইয়া বৃহৎ যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, নিজ গৃহস্থিত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এবং গর্ভাধান নামকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান গুলি সম্পাদন করিতেন। তবে যদ [illegible] পূজা-মুরুকা[illegible]। অশ্বে রথ টানিত; দুই একখানি হস্তীর রথও ছিল। [illegible]গণকে এক্ষণে যেরূপে ধরে, সে সময়েও সেই রূপে ধরিত।

এই সময়ে হিন্দুদিগের বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশ্বাস আমরা গ্রীক-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। তাঁহারা বলিতেন, পৃথিবী গোলাকার, ঈশ্বরসৃষ্ট ও ঈশ্বরদ্বারা শাসিত; পৃথিবী জল হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; চারি ভূত ভিন্ন অন্য একটি ভূত আছে এবং সেই-ভূত হইতে গগন ও নক্ষত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে পৃথিবী অবস্থিত। প্রাচীন কালের হিন্দুরা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতেন।

গ্রীকগণ হিন্দুদিগের উৎসবের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যবিভূষিত হস্তী, চারি অশ্বের শকট, বলদের শকট এবং শিক্ষিত সেনা ধীরে ধীরে চলিত। সুবর্ণমণ্ডিত

ও অলঙ্কারও পরিধান করিতেন। তাঁহারা শ্মশ্রু রঞ্জিত করিতেন, প্রত্যেকে নিজের অন্ন প্রস্তুত করিতেন এবং ধান্য মদিরা ভিন্ন অন্য কোনও মদিরা ব্যবহার করিতেন না। ধান্যের মদিরাও অতি অল্প সেবিত হইত।

হিন্দুগণ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ, সুন্দর ও কার্য্যপটু ছিলেন; সাহসে তাঁহাদের তুল্য জাতি এশিয়াতে গ্রীকেরা আর দেখেন নাই। তাঁহারা পানাসক্ত ছিলেন না, মিতব্যয়ী ও শান্ত ছিলেন, যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তৎপর ছিলেন, সরলস্বভাব ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। গ্রীকেরা আরও বলেন যে, হিন্দুগণ এরূপ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, বিচার দ্বারে যাইতেন না, এত সৎ ছিলেন যে, দ্বারে কুলুপ আবশ্যক ছিলনা এবং চুক্তিবাক্য কাগজে লিখিবার আবশ্যক হইত না।

গ্রীকগণ আরও বলেন, কোনও হিন্দু কখনও মিথ্যা কথা কহিতেন না।

নানা শাস্ত্রানুশীলন। পূর্ব্বকালে কুরু-পঞ্চাল ও কোশল বিদেহদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল, মগধ প্রাধান্যের সময়ের হিন্দুদিগেরও সেই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহারাও ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগকে পূজা করিতেন, পুরোহিত ডাকাইয়া বৃহৎ যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, নিজ গৃহস্থিত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এবং গর্ভাধান নামকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান গুলি সম্পাদন করিতেন। তবে যজ্ঞ সম্পাদন বিধিঘটিত পুস্তক গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্তরূপে প্রণীত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সুদীর্ঘ "ব্রাহ্মণ" ও "আরণ্যকে" যে যজ্ঞ সমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই যজ্ঞের নিয়মগুলি সংক্ষিপ্ত "সূত্র" রূপে প্রণীত হইতে লাগিল। আমরা যাহাকে এক্ষণে "কল্প সূত্র" বলিয়া জানি সে গ্রন্থ গুলি এই সময়ে রচিত হয়।

কল্পসূত্রের তিন অংশ আছে। এক অংশকে শ্রৌতসূত্র কহে এবং ইহাতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম গুলি সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশ গৃহসূত্র, ইহাতে গৃহস্থের পালনীয় নিয়মাদি ও ক্রিয়া কলাপ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা গৃহস্থের কর্ত্তব্য, নামকরণ, উপনয়ন, উদ্বাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী সমস্ত জানিতে পারি। তৃতীয় অংশকে ধর্ম্মসূত্র কহে এবং এই ধর্ম্মসূত্রে আর্য্যদিগের পালনীয় সামাজিক নিয়ম গুলি

জানিতে পারি। তৎকালের দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি, স্ত্রীধন ও উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম, ভূমিকর্ষণ ও ঋণপরিশোধবিধি প্রভৃতি যাবতীয় বিধান গুলি আমরা এই ধর্ম্মসূত্রে প্রাপ্ত হই। ফলতঃ এই প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, পরাশরসংহিতা প্রভৃতি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, এই সময়ের সকল শাস্ত্রই সূত্র আকারে রচিত হইত।

প্রসিদ্ধনামা পাণিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ব্যাকরণ সূত্রাকারে রচনা করিলেন। বেদিনির্ম্মাণ সম্বন্ধে জ্যামিতির নিয়ম সকল সূত্রাকারে রচিত হইল, তাহাকে সুল্বসূত্র কহে। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলিও সূত্রাকারে রচিত হইল। এই কালের হিন্দুগণ যে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া সমগ্র জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই ষড়্‌দর্শনও সূত্রাকারে পরিণত হইল।

ষড়্‌দর্শন। উপনিষৎসমূহে আমরা যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাই, তাহা হইতেই ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। উপনিষৎ রচনার অনুমান দুইশত বৎসর পর, খৃষ্টের পূর্ব্বে সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কপিল প্রথমে সাংখ্যদর্শন প্রচার করিলেন। জগতে ইহার পূর্ব্বে প্রকৃত মানসিক দর্শন কখনও প্রচারিত হয় নাই। সাংখ্যদর্শনের চিন্তাশীলতা ও গভীরতা অদ্যাপি সভ্যজগতে প্রশংসিত, এবং আধুনিক কোন কোন প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ ও ফরাসী দার্শনিক, অনেকটা এই সাংখ্যদর্শনের মত

সমর্থন করেন। কিন্তু কপিলের সাংখ্যদর্শনে একটি অভাব আছে। যাহা যাহা মনুষ্যের পরিজ্ঞেয়, বৈজ্ঞানিক কপিল তাহাই স্থির করিয়াছেন, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মনুষ্যের অপরি-জ্ঞেয় বলিয়া সে বিষয়টি পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই অভাবটি দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষে পতঞ্জলির যোগদর্শন প্রণীত হইল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা, ঈশ্বরকে জানিবার উপায় উদ্ভাবন করাই যোগদর্শনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটি অতি মহৎ, কিন্তু কালক্রমে উপায় গুলি গর্হিত হইয়া পড়ি-য়াছে। যোগশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভারতবর্ষে অনেক তন্ত্র মন্ত্র ও গর্হিত রচনা রচিত হইয়াছে এবং অনেক ভণ্ড যোগী অনেক প্রকার 'ভণ্ড সাধনা' করিয়া অমানুষিক ক্ষমতা পাই-বার ভান করিয়া থাকে।

গোতম ভারতবর্ষে ন্যায়শাস্ত্র আবিষ্কার করেন। খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্থশতাব্দীতে আরিষ্টটল ইউরোপে ন্যায়শাস্ত্র(Logic) প্রচার করেন। গোতম বোধহয় তাঁহার পূর্ব্বকালবর্ত্তী। গোতমের ন্যায়শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া কণাদ বৈশেষিকদর্শন প্রচার করেন। এই দর্শনকে ফিজিক্‌স্ (Physics) বলিলেও হয়, কেন না অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা হইতে কিরূপে দ্রব্যাদি ও জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করা এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

সাংখ্যদর্শনের ন্যায়, ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শনেও ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় বলিয়া গিয়াছে। এই অভাবটি দূর করিবার জন্য আর দুইটি দর্শন প্রণীত হইল। একটি পূর্ব্বমীমাংসা, অপরটী উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত।

বৈদিকধর্ম্ম ও বৈদিক অনুষ্ঠান সমর্থন করা এই দুইটি

দর্শনেরই উদ্দেশ্য। তবে জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসায় কেবল যজ্ঞ-কর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং ব্যাস রচিত উত্তর মীমাংসায় বা বেদান্তে যজ্ঞানুষ্ঠানের দিকে তত দূর আস্থা না দেখাইয়া পরব্রহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে যত্ন করা হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে বৈদিক যজ্ঞ সমর্থন করিয়াছে; উত্তরমীমাংসাদর্শনে বেদ ও উপনিষৎমূলক পরব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছে। খৃষ্টের পর পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নামা কুমারিল ভট্ট পূর্ব্বমীমাংসার একটি টীকা লিখিয়াছেন এবং খৃষ্টের পর অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নামা শঙ্করাচার্য্য উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তের একটি টীকা লিখিয়াছেন।

ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহার। আমরা পূর্ব্বে যে গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে এই সময়ে হিন্দুদিগের সামাজিক ও সাংসারিক আচার ব্যবহার আমরা অবগত হই। আর্য্যহিন্দুগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন এবং সকলেই বেদ অধ্যয়ন করিতেন, যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এবং উপবীত ধারণ করিতেন। বৈশ্য অর্থাৎ সাধারণ লোকে নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিত, কেবল লেখা পড়া করা কাহারও ব্যবসায় ছিল, কেহ বৈদ্য, কেহ বণিক্, কেহ স্বর্ণকার, কেহ কর্ম্মকার, কেহ কুম্ভকার, কেহ তন্তুবায়, কেহ কৃষক, কেহ মেষপালক ছিল;

---

* বলা বাহুল্য যে বেদের সঙ্কলনকারী ব্যাস বেদান্তের প্রণেতা ব্যাস নহেন। অনুমান ১৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে বেদ সঙ্কলিত হয়, অনুমান ৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে বেদান্তদর্শন প্রণীত হয়। মধ্যে সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও বৈশ্যগণ এক-জাতি ভুক্ত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়মূলক ভিন্ন ভিন্ন জাতি সংগঠিত হয় নাই এবং সকল ব্যবসায়াবলম্বী বৈশ্যগণ বেদাধ্যয়নে, যজ্ঞ সম্পাদনে উপবীত ধারণে সক্ষম ছিল।

শূদ্রগণও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিত, কিন্তু তাহারা বেদাধ্যয়নে সক্ষম ছিল না।

এই সময়ের গ্রন্থাদিতে যে "মিশ্রজাতির" কথা লিখা আছে, তাহারা অধিকাংশই অনার্য্যজাতি। তাহারা ক্রমে আর্য্যদিগের সহিত মিশিয়া গিয়া মিশ্রজাতীয় হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এক জাতির পুরুষের সহিত অন্য জাতীয় স্ত্রীর বিবাহ হওয়া মিশ্রজাতির উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ যে জনশ্রুতি আছে, সেটি ভ্রম মাত্র। অনার্য্যগণ দলে দলে হিন্দুসভ্যতা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইল এবং তাহারাই মিশ্রজাতি।

আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী হিন্দুগণ মিশ্রজাতি, এরূপ যে জনশ্রুতি আছে, তাহাও ভ্রম মাত্র। প্রাচীন গ্রন্থে মিশ্রজাতির যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কৃষক বা মেষপালক, কর্ম্মকার বা স্বর্ণকার, তন্তুবায় বা বণিক্ বৈদ্য বা কায়স্থ ইহাদিগের নাম নাই। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়মূলক আধুনিক জাতি তৎকালে বৈশ্য জাতির অন্তর্গত ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যবসার বিভিন্নতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতি তৎকালে সংগঠিত হয় নাই। অহিন্দু ও অনার্য্যগণই ক্রমে হিন্দুসভ্যতা ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া মিশ্রজাতি হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যজ্ঞ অনেক প্রকার ছিল, সমস্ত গণনা করিলে সহস্র প্রকারেরও অধিক হয়। তৎকালের কোন কোন সূত্রকার এই অসংখ্য প্রকার যজ্ঞকর্ম্মকে প্রধান ২১ প্রকার যজ্ঞে বিভক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ ৭ প্রকার হবির্যজ্ঞ, ৭ প্রকার সোমযজ্ঞ এবং ৭ প্রকার পাকযজ্ঞ। অগ্নি-আধান, অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, আগ্রহায়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও সৌত্রামী, এই কয়েকটি হবির্যজ্ঞ অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শিন্, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম এই কয়েকটি সোমযজ্ঞ। অষ্টকা, পর্ব্বন, পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী এবং আশ্বযুজী, এই কয়েকটি পাকযজ্ঞ।

ভিন্ন ভিন্ন সোমযজ্ঞের বিশেষ বিবরণ দিবার আবশ্যক নাই। হবিযজ্ঞ গুলির বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া এবং বিবাহ সম্পাদন করিয়া গৃহস্থ নিজ গৃহে যজ্ঞ অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহাকেই অগ্নি-আধান বলিত এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সেই অগ্নিতে যে দুগ্ধ আহুতি প্রদান করা হইত তাহাকে অগ্নিহোত্র কহিত।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় দশপূর্ণমাস যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। নূতন ফসল কাটিয়া আগ্রহায়ণী যজ্ঞ সম্পাদিত হইত, চারিমাস অন্তর একটি যজ্ঞ করা যাইত, তাহাকে চাতুর্মাস্য কহিত। পশুবলির সহিত নিরূঢ়পশুবন্ধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইত, এবং অতিশয় সোমপান দোষ অপনয়নার্থ সৌত্রামণী যজ্ঞ সম্পাদিত হইত।

পাক যজ্ঞ গুলি অতি সরল। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী দিবসে অষ্টকাযজ্ঞ সম্পাদিত হইত এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার সুস্বাদু পিষ্টক প্রস্তুত হইত। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে পর্ব্বণ হইত এবং সেই সেই দিবসে উপবাসাদি দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। প্রতি মাসে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ সম্পাদিত হইত এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত। শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসে অবশিষ্ট চারিটি পাকযজ্ঞ সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বোল্লিখিত ২১টি যজ্ঞ ভিন্ন আরও ১৯টি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান বা সংস্কারের কথা প্রাচীন সূত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। সে সংস্কার গুলির মধ্যে অনেক গুলি আধুনিক হিন্দুদিগেরও অনুষ্ঠিত। নারী অন্তঃসত্ত্বা হইলে গর্ভাধান পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। সন্তান হইলে জাতকর্ম্ম ও নামকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। তাহার পর অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে চারিটি সংস্কার। বেদাধ্যয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে অভিষেক বা স্নান করিয়া লোকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত। তৎপরে বিবাহ এবং তৎপরে গৃহস্থের দৈনিক পালনীয় পাঁচটি মহাযজ্ঞ, অর্থাৎ দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত ও পরব্রহ্মের প্রতি অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য সাধন।

পূর্ব্বোক্ত ২১টি যজ্ঞ ১৯টি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৪০টি সংস্কার হিন্দু মাত্রেরপালনীয় ছিল; ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমান অধিকার ছিল; আর্য্যহিন্দুমাত্রেই ইহার অনুষ্ঠানে সমান আনন্দলাভ করিতেন; কিন্তু পবিত্র

মন, পবিত্র আচরণ ও সদ্গুণ গুলির চর্চ্চা ৪০টি সংস্কার হ
ক্ষাও মহৎ, তাহা সূত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গি
ছেন। ধর্ম্মসূত্র প্রণেতা গৌতম লিখিয়া গিয়াছেন "যি
সদ্গুণ বিহীন হইয়া ৪০টি সংস্কার অনুষ্ঠান করেন তি
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন না। পরন্তু যিনি সদ্গুণান্বিত হই
কতিপয় মাত্র সংস্কার অনুষ্ঠান করেন তিনিই ব্রহ্মলো
প্রাপ্ত হইবেন।" ধর্ম্মসূত্র প্রণেতা মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছে
"চক্ষু না থাকিলে যেমন সুন্দরী ভার্য্যা সুখকরী হয় ন
সেইরূপ যাহার সদাচরণ নাই, বেদ বেদাঙ্গ ও যজ্ঞক্রি
তাহাকে কোনও ফল প্রদান করে না।"

গৌতম বুদ্ধ। হিন্দুগণ নানা যজ্ঞ ও সাংসারিক অনু
ষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রকৃত সদাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কত
অংশে বিস্মরণ হইলেন। সিন্ধুনিবাসী আদিম হিন্দুগণ প্রা
ভয়ে যেরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতেন, এক্ষ
হিন্দুগণ দেবগণকে সেরূপ ভক্তি করিতেন না। গঙ্গাতী
বাসী কোশল, বিদেহ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ উপনিষ
যেরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভে উৎসাহী হইয়াছিলেন
এক্ষণে হিন্দুগণ সেটও ভুলিলেন। কেবল যজ্ঞ কার্য্যে
আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল, যজ্ঞের নিয়মাবলী বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ কর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগের প্রাধা
বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যাঁহারা কপিল প্রভৃতি দার্শনিক
দিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, যাঁহারা চিন্তাবলে সক
মনুষ্যের সমতুল্যতা বুঝিতে পারিলেন, যাঁহারা পবিত্র আচ
রণই ধর্ম্ম এই সার কথাটি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা আ

ব্রাহ্মণ প্রাধান্য, জাতিগত বিভিন্নতা এবং যাগ যজ্ঞের মিথ্যা আড়ম্বর সহ্য করিতে পারিলেন না গৌতম বুদ্ধ এই প্রকার সহৃদয় ও চিন্তাশীল লোক ছিলেন, সুতরাং তিনি নূতন প্রচার করিলেন।

অনুমান ৫৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে কপিলবস্তু নামক গ্রামে শাক্য শ গৌতমের জন্ম হয়। তিনি একজন ক্ষুদ্র রাজার পুত্র ছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যালাভ করিয়া একটি সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং অচিরে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইল। সংসারে যাহাকে লোকে সুখ কহে, গৌতমের সে সকলই ছিল। ধন, মান, রাজ্য, পবিত্র চরিত্রা ও সুন্দরী গৃহিণী, পুত্র সন্তান, সুজনগণ, এ সকলই গৌতমের ছিল। তথাপি মানব-সাধারণের ক্লেশ চিন্তায় তাঁহার উদার হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল; সে ক্লেশের কোনও প্রতিকার আছে কি না এই বিষয় উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি দেশত্যাগী ও গৃহত্যাগী হইলেন।

প্রথমে বৈশালী প্রদেশে যাইয়া একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন; সেই ব্রাহ্মণের আরও তিন শত শিষ্য ছিল। তথায় বিদ্যালাভ করিয়া মগধের রাজধানী রাজগৃহে অন্য এক ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন। সেই ব্রাহ্মণের সাত শত শিষ্য ছিল। এই ব্রাহ্মণের অর্জ্জিত বিদ্যায় [illegible] উদ্দেশ্যসাধন হইল না, শান্তিলাভ হইল না। তখন তিনি উরুবিল্ব গ্রামের নিকট একটি নির্জ্জন স্থানে ছয় বৎসর ব্যাপী কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট তপস্যায় শান্তিলাভ হইল না; উদ্ধারের উপায় উদ্ভা-

বন হইল না; তখন তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন স্বয়ং চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে গৌতম জ্ঞান লাভ করিলেন এবং তখন "বুদ্ধ" নাম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ বিখ্যাতনামা বারাণসীধামে আসিয়া জগৎকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দুই সহস্র বৎসর পর অদ্য জগতের মধ্যে পঞ্চাশৎ কোটি মনুষ্য ক্ষত্রিয়-গুরুর এই জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

মগধরাজ বিম্বসার বুদ্ধদেবকে স্বদেশে আহ্বান করিলে বুদ্ধ, সেই রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে পুনরায় আগমন করিলেন এবং তথায় উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরে কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীনগরে বাস করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন; দ্বাদশ বৎসর পরে বুদ্ধ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আপন রমণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রী ও পুরুষকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি রাজগৃহ পুনরায় দর্শন করেন তখন অজাতশত্রু মগধদেশের রাজা। তিনি গৌতমকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

বুদ্ধ ইহার পর বৈশালী নগর দর্শন করিয়া কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করেন ও সেই নগরের নিকটে আসিয়া একটি বনে প্রাণত্যাগ করেন। অনুমান ৪৭৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম। সমাজ সে সময়ে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যে উৎপীড়িত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের সহায়তা না লইলে কোন বৃহৎ যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হয় না, যেন মনুষ্য পুরোহিতের

সাহায্য ভিন্ন জগদীশ্বরকে আরাধনা করিতে পারেন না। শূদ্র ও মিশ্রজাতির পক্ষে যজ্ঞকার্য্য একেবারে নিষিদ্ধ; যেন জগদীশ্বর হীনমানবের উপাসনা গ্রহণ করেন না। সহৃদয় গৌতম বুদ্ধ এ অত্যাচার এ অসমতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সকল মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বৌদ্ধগণ জাতিবিচ্ছেদ মানেন না। সকল মনুষ্যই সমান, সকল শ্রেণীর লোকেই পুরোহিত হইতে পারে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই মহৎ উদার শিক্ষা দান করে।

গৌতম বুদ্ধ দ্বিতীয় একটি মহৎ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বেদের প্রাচীন শিক্ষা সে সময়ে কেবল যজ্ঞের আড়ম্বরে পরি-ণত হইয়াছিল, পবিত্রতা ও পুণ্যকার্য্য অপেক্ষা পুরোহিতদিগের ক্রিয়া কলাপের অধিক সমাদর হইয়াছিল। বেদ ঈশ্বরদত্ত একথা গৌতম একেবারে অস্বীকার করিলেন, বৈদিক যাগ যজ্ঞে কোনও উপকার আছে গৌতম তাহা অস্বীকার করিলেন, কেবল পুণ্য কর্ম্ম ও পবিত্র আচরণে মনুষ্যের উদ্ধার হয়, এই মহানীতি প্রচার করিলেন। এ জন্মে না হয় পুনঃ পুনঃ জন্মের চেষ্টার পর মনের পাপ, ক্লেশ ও বাঞ্ছা ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে, তখন মনুষ্য পবিত্র, পাপশূন্য ক্লেশশূন্য, বাঞ্ছাশূন্য হইবে, সেই অবস্থাই মোক্ষ, তাহাই বুদ্ধপদ, তাহাই "নির্ব্বাণ"।

অন্যান্য বিষয়ে গৌতম হিন্দুদিগের প্রচলিত বিশ্বাস গুলি রক্ষা করিয়া গেলেন। জন্মের পর জন্ম হয় তাহা তিনি প্রচার করিলেন, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে এ দেবগণও জন্মে জন্মে সেই

পবিত্রতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যিনি সে পবিত্রত পাইয়াছেন, যিনি "বুদ্ধ" তিনি সকল দেবের উপর, তাঁহার আর পুনর্জন্ম নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মহৎ অভাব আছে। সাংখ্যদর্শনে পারদর্শী গৌতমবুদ্ধ নিজ প্রকাশিত ধর্ম্ম প্রণালীতে ঈশ্বরকে স্থান দেন নাই। পুণ্যই পুণ্যকার্য্যের ফল, পবিত্র জীবনই পরম বাঞ্ছনীয় ফল, নিষ্কাম ও নিষ্পাপ পবিত্রতাই স্বর্গ, গৌতম এই শিক্ষা দিয়াছেন। ঈশ্বর মনুষ্যের অপরিজ্ঞেয়, কপিল এই কথা বলিয়াগিয়াছেন, এবং গৌতমবুদ্ধও পবিত্র জীবন ও নিষ্কাম ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ঈশ্বর জানিতেন না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক তিন অংশে বা "পিটকে" বিভক্ত, সেই জন্য তাহাকে ত্রিপিটক কহে। (১) গৌতম স্বয়ং যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহাকে "সূত্র" কহে। (২) বৌদ্ধ মঠবাসী-দিগের নিয়মাবলিকে "বিনয়" কহে। (৩) এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা সমূহকে অভিধর্ম্ম কহে। গৌতমের মৃত্যুর পরই মগধদেশের রাজধানী রাজগৃহে বৌদ্ধগণ একটি সভায় সমবেত হইয়া ধর্ম্মপুস্তক গুলি সঙ্কলন করেন। ইহার এক শত বৎসর পর বৈশালীনগরে দ্বিতীয় একটি সভা হইয়া ধর্ম্মপুস্তক পুনরায় সঙ্কলিত হয়। তাহার পর প্রসিদ্ধ নামা অশোক রাজার সময় অনুমান ২৪২ পূঃ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় একটি সভা হয়, এবং ঐ সভায় বৌদ্ধ "ত্রিপিটক" পরিশুদ্ধ হইয়া যে আকার ধারণ করেন, অদ্যাপি তাহার প্রায় সেই আকারই আছে। এই ত্রিপিটক দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত। উত্তর দেশে অর্থাৎ তিব্বত, চীন প্রভৃতি

দেশে যে সকল বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক প্রচলিত আছে তাহাও অনেকাংশে এই ত্রিপিটকের সদৃশ।

বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মঠে বাস করেন এবং চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্মের আলোচনা করেন। তাঁহাদিগকে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী কহে। সকল শ্রেণীর লোকই ধর্ম্মব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ভিক্ষু হইতে পারে। তাঁহারা হরিদ্রাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করেন, মস্তকমুণ্ডন করেন, ও অনাবৃত পদে গমনাগমন করেন। প্রাণীমাত্রেরই প্রতি বৌদ্ধদিগের অতিশয় স্নেহ। তাঁহারা কদাচ প্রাণিহত্যা করেন না। পাছে খাদ্যের সহিত কোন ক্ষুদ্র প্রাণী উদরসাৎ হয়, এই ভয়ে বৌদ্ধপুরোহিত সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ভোজন করেন, উপবেশনকালে সযত্নে স্থান পরিষ্কার করিয়া উপবেশন করেন, এবং কেহ কেহ নাসিকা ও মুখের উপর সর্ব্বদা একখানি বস্ত্র বাঁধিয়া রাখেন।

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু চীন প্রভৃতি অন্যান্য দেশে এই ধর্ম্ম অনেকে অবলম্বন করে। ফলতঃ জগতে অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক যত আছে, হিন্দু, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক তত নাই।

আমরা "ধর্ম্মপদ" নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক হইতে দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব।

"বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ করিলে কখনই তাহার উপশম হয় না; বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে প্রীতি প্রদর্শন করিলেই তাহার উপশম হয়,—এই সনাতন নিয়ম॥ ৫॥

"যে লোক নিজের হিতোপদেশ কার্য্যে পরিণত না করে তাহার নিষ্ফল বাক্যগুলি সুন্দর ও সুবর্ণ কিন্তু গন্ধশূন্য পুষ্পের ন্যায় ॥ ৫১ ॥

"চন্দন বা টগর, পদ্ম বা বস্‌সিকী পুষ্পের সুগন্ধ হইতে সুকৃতির আঘ্রাণ সমধিক ॥ ৫৫ ॥

"এক জন সংগ্রামে সহস্র সহস্র লোককে জয় করেন, অপর একজন নিজের মন সংযত করেন;—এই শেষোক্ত ব্যক্তিই বিজেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৩ ॥

"যিনি রিপু দমন করিতে অশক্ত তাঁহার নগ্নাবস্থা বা জটাধারণ, সমল বাস বা উপবাস, ভূমি শয্যা বা ধূলিলেপন বা নিশ্চল ভাবে উপবেশন, এ সমস্তই বৃথা; এ সমস্ত সাধনায় তাঁহাকে পবিত্র করে না ॥ ১৪১ ॥

"যিনি সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও স্থৈর্য্য অবলম্বন করেন, যিনি ধীর, নিরুদ্বেগ, সংযতমনাঃ ও সংযতরিপু, যিনি পরনিন্দা করেন না, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রামণ তিনিই ভিক্ষু ॥ ১৪২ ॥

"পাপ পরিহার, পরোপকার সাধন, ও নিজের মন পবিত্র করণ,—বুদ্ধের এই উপদেশ ও ধর্ম্ম ॥ ১৮৩ ॥

"সত্য কথা কহ, ক্রোধ ত্যাগ কর, দানশীল হও; এই তিন উপায়ে দেবসন্নিধানে যাইবে ॥ ২২৪ ॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ কাল।

অনুমান ২৬০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

অশোক রাজা। খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত সামান্য লোকে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। পরে খৃষ্টের পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহাবল পরাক্রান্ত অশোক রাজা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার করিলেন। এই সময় হইতে প্রায় আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মই ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং এই আটশত বৎসরকে বৌদ্ধকাল বলা যায়।

অশোকের পিতা যখন মগধরাজ্যের ও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন, তখন অশোক উজ্জয়িনী প্রদেশে শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অনুমান ২৬০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অশোক মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্নবান হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনুমান ২৪২ পূঃ খৃষ্টাব্দে রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে একটি বৌদ্ধ সভা আহূত হয়, এবং সেই

সভায় বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক "ত্রিপিটক" সংশোধিত হয়। তৎপর অশোক নিজ পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র মহেন্দ্রকে কয়েক জন বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের সহিত সেই ত্রিপিটক লইয়া অনুমান ২৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে সিংহলদ্বীপে প্রেরণ করেন। ইহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ ঐ দ্বীপ অধিকার করিয়া তথায় হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে মগধ বা অঙ্গ রাজ্যের বিজয়সিংহ নামক একজন রাজপুত্র কোন দোষের জন্য নিজ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্র পথে গমন করেন,এবং সিংহল দেশ অধিকার করিয়া তথায় প্রথমে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেন। সেই অবধি সিংহলদেশবাসীরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু মহেন্দ্র যখন বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি লইয়া গিয়া সিংহল দ্বীপে ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন তখন ঐ দেশের কি রাজা কি প্রজা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সিংহলবাসিগণ বৌদ্ধ।

আর্য্যাবর্ত্তের সমগ্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এবং অহিংসা, দয়া, পবিত্রাচরণ প্রভৃতি সদ্গুণগুলি প্রচার করিবার জন্য সম্রাট্ অশোক দেশে দেশে পর্ব্বতে বা প্রস্তর খণ্ডে সেই ধর্ম্মনিয়মাবলী খোদিত করিবার আদেশ প্রচার করেন। অদ্যাবধি পঞ্জাব এবং গুর্জ্জর প্রদেশ হইতে উড়িয্যাপর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও প্রস্তরস্তম্ভে অশোকের প্রচারিত ধর্ম্মনিয়মাবলী খোদিত রহিয়াছে।

কিন্তু কেবল ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াই অশোক সন্তুষ্ট রহিলেন না। তিনি বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া অন্যান্য দূর দেশে পাঠাই

লেন। তাঁহার খোদিত নিয়মাবলী হইতে প্রকাশ পায় যে তিনি সিরিয়াদেশের আণ্টিয়ক রাজা, মিসরদেশের টলেমী রাজা, মাসিডনদেশের আণ্টিগোনস রাজা, সাইরিণী দেশের মাগাস রাজা এবং এপিরসদেশের আলেক্জণ্ডর রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সন্ধির একটি নিয়ম এই যে উপরি উক্ত দেশের রাজগণ নিজ নিজ দেশে বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার অনুজ্ঞা দিবেন। এই নিয়মানুসারে অশোকরাজ উক্ত দেশ সমূহে বৌদ্ধপ্রচারক প্রেরণ করিলেন, এবং সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ ধর্ম্ম-নীতি গৃহীত হইতে লাগিল। বিশেষ সিরিয়া দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষরূপে আদৃত হইল, এবং তথাকার বৌদ্ধ ভিক্ষু-গণ "এসিনি" নাম ধারণ করিয়া ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। খৃষ্টের জন্মের সময় পেষ্টাইনের "এসিনি" গণ তাহাদিগের অহিংসা ধর্ম্ম ও পবিত্রাচরণের জন্য অতি-শয় সম্মানিত হইয়াছিলেন একথা আমরা রোমক পণ্ডিত প্লিনীর পুস্তক হইতে জানিতে পারি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মনীতি অনেকাংশেই এক তাহা খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যিশুখৃষ্ট পেলেষ্টাইননামী বৌদ্ধ অর্থাৎ "এসিনি" দিগের নিকট হইতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির অনেক পবিত্র নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহাই খৃষ্টীয়-ধর্ম্মনীতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

মগধরাজ্য। অনুমান ২২২ পূ. খৃষ্টাব্দে অশোক রাজার মৃত্যু হয়, এবং তৎপর তাঁহার বংশীয়গণ ক্রমে হীনবল

হইতে লাগিল। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নী রমণীর পুত্র ছিলেন, সেই জন্য ঐ বংশকে মৌর্য্যবংশ কহে। অশোকের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পর মৌর্য্য বংশ বিলুপ্ত হইল, এবং তাহার পর ১৮৩ হইতে ২৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সঙ্গ ও কাণ্ব নামক দুই বংশের রাজগণ মগধদেশে রাজত্ব করেন। তাহার পর অন্ধ্রগণ সার্দ্ধ চারিশত বৎসর (২৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) মগধ দেশে রাজত্ব করেন। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজগণ যখন আর্য্যাবর্ত্তে মগধ দেশের প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিলেন, অন্ধ্রগণও সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অপনাদিগের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন আর্য্যাবর্ত্তের রাজবংশীয়গণ হীন বল হইয়া গেল, তখন সেই দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রবংশের কোন শাখা মগধ রাজ্য জয় করিয়া সার্দ্ধ চারিশত বৎসর বিপুল ক্ষমতার সহিত আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিতে লাগিলেন।

এই অন্ধ্রগণও পূর্ব্ববর্ত্তী মগধরাজদিগের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে তর্ক বিতর্ক চলিত তাহা প্রায়ই পুস্তকে বা সভাস্থলে প্রদর্শিত হইত। অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম বিরোধ লইয়া যেরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেরূপ প্রায় লক্ষিত হয় নাই

অন্ধ্রদিগের পর গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণ ভারতবর্ষে অনুমান একশত বৎসর রাজত্ব করেন। সে কালে সকল

বৈশ্যগণ "গুপ্ত" নাম ধারণ করিতে পারিত সুতরাং গুপ্ত বংশীয় সম্রাট্‌গণও বোধ হয় বৈশ্য ছিলেন। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণ কান্যকুব্জ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জনগরে গুপ্তদিগের প্রচারিত সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। তৎকালে পারস্য দেশে সাসনীয় রাজগণ বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং গুপ্ত ও সাসনীয় সাম্রাট্‌দিগের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল, এবং সর্ব্বদাই পত্রাদি প্রেরিত হইত। কথিত আছে যে হূনদিগের আক্রমণ কালে বহরাম্ গোর নামক পারস্য রাজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কান্যকুব্জের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুমান ৫০০ খৃষ্টাব্দের পরই গুপ্ত বংশীয় সম্রাট্‌গণ হীনবল হইয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়েন। গুপ্ত বংশীয় রাজগণ প্রায়ই হিন্দু ছিলেন, তথাপি বৌদ্ধদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং বৌদ্ধ মঠ সংস্থাপনার্থ অনেক অর্থ ও ভূমি দান করিতেন।

বিদেশীয়দিগের আক্রমণ। মগধ দেশে ও কান্যকুব্জে যখন এইরূপে রাজবংশ পরম্পরা রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে বিদেশীয়গণ বার বার আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। আক্রমণকারিগণ অনেক সময়ে জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন কোন প্রদেশখণ্ডে নিজ নিজ রাজ্য স্থাপন করিল। কিন্তু তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, বৌদ্ধ হিন্দুদিগের সহিত মিশিয়া গেল, সুতরাং বিজেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে প্রভেদ রহিল না।

আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে মগধ দেশের রাজা অজাতশত্রু তুরেণীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাস্ত করিয়া মগধরাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। এই তুরেণীয় আক্রমণকারিগণ (তাহারা ইউ-চি জাতীয়) ক্রমে পশ্চিম-দিকে যাইয়া বাক্‌ট্রিয়া নামক গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিল। বিজিত বাক্‌ট্রিয়ান্ গ্রীকগণ খৃষ্টের পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমে অনেক প্রদেশে আপনাদিগের রাজত্ব স্থাপন করিল। মিলাণ্ডর নামক একজন বিজয়ী গ্রীক রাজাকে, বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জ্জুন, তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

খৃষ্টের পূর্ব্বে প্রথম শতাব্দীতে ইউ-চি বংশীয় তুরেণীয়গণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। এবং খৃষ্টের পর প্রথম শতাব্দীতে এই জাতীয় কনিষ্করাজা কাশ্মীরের অধিপতি হইয়া কাবুল ও কাশ্‌গড় হইতে আগ্রা ও গুর্জ্জর প্রদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কনিষ্ক বৌদ্ধ ছিলেন, এবং কাশ্মীরে একটি সভা স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা ও টীকাদি রচনা করাইলেন। তাঁহার শাসন কালে কাশ্মীর হইতে বৌদ্ধপ্রচারকগণ তিব্বত ও চীনদেশে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে শকাব্দা নামে যে অব্দ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, সে অব্দ বৌদ্ধ রাজা কনিষ্ক নিজের সময় হইতে প্রচলিত করেন।

কনিষ্কের পর কাবুল হইতে কাম্বোজীয়গণ ভারতবর্ষে আগমন করিতে লাগিল এবং দক্ষিণে "শাহ" উপাধিধারী এক

দল বিজেতা সৌরাষ্ট্রে রাজ্য স্থাপন করিয়া খৃষ্টের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অবশেষে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হুন জাতীয় তুরেণীয়গণ পঙ্গপালের ন্যায় পারস্য ও পশ্চিমভারতবর্ষ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পঞ্জাবের উত্তরাংশে তাহারা একটি বিস্তীর্ণরাজ্য স্থাপন করিল।

এই সমস্ত বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাস্ত করিতে পারে এরূপ বীর ভারতবর্ষে অনেক শতাব্দী অবধি দৃষ্ট হয় নাই। অবশেষে খৃষ্টের পর ষষ্ঠশতাব্দীতে উজ্জয়িনীর সম্রাট্ খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্য বিদেশীয় শত্রু অর্থাৎ শক-দিগকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুনামের ও বীরত্বের গৌরব রক্ষা করেন। বিক্রমাদিত্য এবং পৌরাণিক কালের ইতিহাসকথা ইহার পরের পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

হুয়েন সাঙ্ লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ। ৫০০ খৃষ্টাব্দের পর বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং নূতন আকারের, অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন ভ্রমণকারী হুয়েন সাঙ্ বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাস্ত্র সংগ্রহার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং এদেশের একটি বিস্তীর্ণ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধকালের উপসংহার সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ সভ্যতা প্রচলিত ছিল তাহা আমরা এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি।

হুয়েন সাঙ্ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে যাত্রা করেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিনি কপিশারাজ্যে প্রবেশ করেন। তৎকালে এক জন ক্ষত্রিয় সেই রাজ্যের রাজা

ছিলেন। তিনি দশটি প্রদেশ শাসন করিতেন। হুয়েন সাঙ্ এই স্থানে ১০০ বৌদ্ধ মঠ, ছয় সহস্র মঠবাসী এবং বহুসংখ্য দেবালয় দৃষ্টি করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে অশোকের সংস্থাপিত স্তূপ দর্শন করেন।

গান্ধারপ্রদেশ ও তাহার রাজধানী পুরুষপুর সে সময়ে কপিশারাজ্যের অধীন ছিল। তথায় তিনি এক সহস্র বৌদ্ধ মঠ ও বহুসংখ্য স্তূপের ভগ্নাবস্থা দেখিলেন, ও হিন্দুধর্ম্মের গৌরব ও বহুসংখ্য জনাকীর্ণ হিন্দু-দেবালয় দেখিলেন; তিনি মহেশ্বরের একটি পবিত্র মন্দির ও নীলপ্রস্তরনির্ম্মিত ভীমার একটি প্রতিমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রদেশের অধিবাসিগণ কাপুরুষ, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনে তৎপর ছিলেন।

কাশ্মীরপ্রদেশে কুস্তীয়বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, ও এই প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মই প্রচলিত ছিল; তথাপি কাশ্মীরে অনেক বৌদ্ধমঠ ছিল। তথায় অনেক বৌদ্ধ পুরোহিতও বাস করিতেন।

শতদ্রুনদী পার হইয়া আর কয়েক স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে হুয়েন সাঙ্ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। মথুরার চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের হীনতা ও হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ গৌরব দৃষ্টি করেন। তিনি অনেক স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন। থানেশ্বরে তিনটি মাত্র বৌদ্ধমঠ ও একশত হিন্দুদেবালয় ছিল, স্রুঘ্নে ৫টি বৌদ্ধমঠ ও একশত হিন্দু-দেবালয় ছিল, মতিপুরে শূদ্ররাজা ছিলেন; হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মপুর, অহিচ্ছত্র ও রামায়ণ-বর্ণিত সাঙ্কাশ্যের বর্ণনা আছে।

কান্যকুব্জ রাজ্যে রাজ্যবর্দ্ধন রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শীলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজধানী দীর্ঘে দুই ক্রোশ এবং প্রস্থে অর্দ্ধ ক্রোশ ছিল, এতদ্ভিন্ন ঐ রাজ্যে বহুসংখ্য পরিখা ও প্রাচীর-বেষ্টিত নগর ছিল। এই স্থানে একশত বৌদ্ধমঠ ও দুইশত হিন্দুদেবালয় ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে শীলাদিত্যের বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি দেশের সমস্ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে যে বৌদ্ধ পঞ্চবাৎসরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছিলেন, হুয়েন সাঙ্ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তৎকালে সমস্ত রাজ্য সমৃদ্ধিশালী, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যে পরিপূর্ণ ছিল।

গৌতমবুদ্ধনিবসিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রাবস্তী ও কপিলবস্তু নগর প্রায় জনশূন্য ও ভগ্নাবস্থাপন্ন হইয়াছিল। শ্রাবস্তীর মঠগুলির ভগ্নাবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদেবালয় বহুসংখ্য ও জনাকীর্ণ ছিল। কপিলবস্তু বুদ্ধের জন্মস্থান; এই রাজ্যের বিষয় হুয়েন সাঙ্ এইরূপ লিখিয়াছেন—"এই স্থানে দশটি নগর আছে, রাজধানীটি ভগ্ন। রাজধানীর মধ্যস্থ রাজবাটী এককালে দেড় ক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল ও সমস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল; ভগ্নাবশিষ্ট অংশগুলি এক্ষণ পর্য্যন্ত অতিশয় উচ্চ ও শক্ত, কিন্তু বহুকালাবধি পরিত্যক্ত রহিয়াছে। পল্লীগ্রামে লোকসংখ্যা অল্প, দেশে রাজা নাই, প্রত্যেক নগরের এক একটি অধ্যক্ষ আছে। এককালে সহস্র মঠ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।" বৌদ্ধধর্ম্মের আদি

স্থানের দুরবস্থা দেখিয়া বৌদ্ধভ্রমণকারী এইরূপে আক্ষেপ করিয়াছেন।

বারাণসী রাজ্য বহুলোকাকীর্ণ পল্লিগ্রামে পরিপূর্ণ, এবং এই অসংখ্য লোকের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, বৌদ্ধ অতি অল্প। ত্রিশটি মঠে তিন সহস্র বৌদ্ধ বাস করিত, একশত দেবালয়ে দশসহস্র হিন্দু মহেশ্বরের পূজা করিত। "কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ মস্তকের উপরে কেবল একটি শিখা রাখে ও উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করে; অন্যান্য লোক পুনরায় জন্ম মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গাত্রে ভস্ম মাখে ও কঠোর তপস্যা করে।" বারাণসী নগরে বিংশতিটি অতি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত ও সুরঞ্জিত কাষ্ঠবিভূষিত মন্দির ছিল, তাহার চারিদিকে পত্রপূর্ণবৃক্ষ ছায়াদান করিত ও পরিষ্কার জল বহিয়া যাইত। যষ্টিহস্ত দীর্ঘ পিত্তলনির্ম্মিত মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। "তাহার আকৃতি গম্ভীর, দেখিলে হৃদয়ে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়, এবং বোধ হয়, যেন প্রতিমূর্ত্তি জীবিত।" হুয়েন সাঙ্‌ বারাণসীর নিকটে সারনাথের হরিণ-উদ্যান সন্দর্শন করিলেন; তথাকার বৌদ্ধমঠে পঞ্চদশ শত বৌদ্ধ বাস করিত।

বৈশালী রাজ্যের রাজধানীও ভগ্নাবশিষ্ট; তাহার পরিধি ছয় কি সাত ক্রোশ। তথায় বহুসংখ্য ভগ্ন মঠ ছিল, তাহার মধ্যে কেবল তিনটি কি চারিটিতে বৌদ্ধগণ বাস করিত। হিন্দু-দেবালয়ের সংখ্যা অনেক অধিক।

মগধে হুয়েন সাঙ্‌ পঞ্চাশটি মঠ ও দশ সহস্র মঠবাসী বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে পাটলীপুত্র

নগরের ভগ্ন হর্ম্ম্যাদি সপ্ত ক্রোশ ব্যাপিয়াছিল, ও তাহার মধ্যে শত শত স্তূপ, ভগ্নমঠ ও দেবমন্দির দেখা যাইত। গয়ানগরীতে সে সময়ে এক সহস্র ব্রাহ্মণপরিবার বাস করিত। এই স্থানে গৌতমবুদ্ধ ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সুতরাং বৌদ্ধভ্রমণকারী এই স্থান দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ "বোধী" বৃক্ষ দেখিলেন ও তথা হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত অসংখ্য পবিত্র ধর্ম্ম নিদর্শন দৃষ্টি করেন। এই স্থানে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী আগমন করিয়া সাত দিন সাত রাত্রি সুগন্ধ পুষ্প ও সুশ্রাব্য বাদ্যে বৌদ্ধপূজাদি সম্পাদন করিত। মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহনগর ভগ্নাবশিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহার নিকটে রাজগৃহ বলিয়া নূতন একটি নগর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরের নিকট নালন্দার মঠ তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। তথায় দশ সহস্র বৌদ্ধ বাস করিত এবং সকল প্রকার শাস্ত্রালোচনা হইত। অষ্টাদশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দর্শন পঠিত হইত, তাহা ভিন্ন বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা, শিল্পবিদ্যা, প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলোচনা হইত। শত গ্রামের কর দ্বারা এই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। হুয়েন সাঙ্ এই মঠে পাঁচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন।

পূর্ব্বদিকে আসিয়া হুয়েন সাঙ্ পুণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তর-বঙ্গদেশ) সমতট (পূর্ব্ব-বঙ্গদেশ) কামরূপ (আসাম) ও তাম্রলিপ্তি (তমলুক) প্রভৃতি স্থান সন্দর্শন করেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ২০টি মঠ ও ১০০ দেবমন্দির ছিল; আসামে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত

ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অপরিচিত। তথাপি আসামের নরপতি সম্রাট্ শীলাদিত্যের পরম বন্ধু ছিলেন, এবং শীলাদিত্যের অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তিতে দশটি বৌদ্ধ-মঠ ও পঞ্চাশটি হিন্দু দেবমন্দির ছিল এবং তথা হইতে অর্ণবপোত সর্ব্বদাই সিংহলদ্বীপে গমনাগমন করিত। ঐ স্থান হইতে হুয়েন সাঙ্ উড়িষ্যা, কলিঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ দেখিয়া দক্ষিণে গমন করিলেন। তিনি উড়িষ্যায় একশত বৌদ্ধমঠ, ও কেবলমাত্র পঞ্চাশটি দেবমন্দির দেখিলেন, কলিঙ্গে ১০টি মঠ ও দুই শত মন্দির ছিল।

দ্রাবিড়ে একশত মঠ ও ৮০টি দেবমন্দির ছিল, তথা হইতে মলয়পর্ব্বত পার হইয়া উত্তর দিকে যাইয়া মহারাষ্ট্র দেশে পঁহুছিলেন। তিনি ঐ দেশের সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন সাঙ্ বলেন, এ স্থানের লোকেরা দীর্ঘকায়, গর্ব্বিত, সৎ এবং সরল। তাহাদিগের উপকার করিলে তাহারা কদাচ বিস্মৃত হয় না; কিন্তু কেহ তাহাদিগের অপকার করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। যদি কেহ তাহাদিগের অবমাননা করে, মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদিগের জীবনভয় তুচ্ছ করিয়া সে অবমাননার প্রতীকার করে; যদি কেহ বিপদে তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনারা বিপদগ্রস্ত হইয়াও তাহাকে রক্ষা করে। কেহ অন্যায়াচরণ করিলে ঐ অন্যায় কার্য্যের প্রতিকার করিবার পূর্ব্বে তাহারা শত্রুকে যথাসময়ে সংবাদ দেয়, পরে উভয়ে বর্ম্মধারণ করিয়া বর্শা

হস্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু যাহারা আপনাদিগকে বন্দী স্বীকার করে, তাহাদিগকে হত্যা করে না। যুদ্ধে কোন সেনাপতি পরাস্ত হইলে, মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাকে কায়িক ক্লেশ দেয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র পরায় এবং এরূপ লজ্জা দেয় যে, সে আত্মহত্যা করে। রাজ্যে সর্ব্বদাই কয়েক শত সাহসী যোদ্ধা প্রস্তুত থাকে, এবং যুদ্ধসময়ে প্রত্যেক যোদ্ধা মদিরায় উন্মত্ত হইয়া বর্শা হস্তে দশ সহস্র শত্রুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। কান্যকুব্জের সম্রাট্ শীলাদিত্য সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশ জয় করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রদেশে একশত মঠ এবং একশত দেবালয় ছিল। মঠবাসী বৌদ্ধের সংখ্যা পাঁচ হাজার, কিন্তু হিন্দু দেবপূজকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

নর্ম্মদানদী পার হইয়া হুয়েন সাঙ্ মালব দেশে আসিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে দুইটি স্থানে বিদ্যার বিশেষ সমাদর ছিল—উত্তর পূর্ব্বে মগধ এবং দক্ষিণপশ্চিমে মালব দেশে। এই রাজ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্ম্মই অতিশয় প্রবল ছিল। পরে অন্যান্য অনেক দেশ সন্দর্শন করিয়া সিন্ধু পার হইয়া হুয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন। হুয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষের ১৩৮টি রাজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ১১০টি তিনি স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পরে খৃষ্টের

সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই হিন্দুধর্ম্ম প্রায় সর্ব্বস্থানে প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। হুয়েন সাঙ্ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতির বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বৈশ্যগণকে বণিক ও শূদ্রগণকে কৃষিজীবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক মিশ্রজাতির কথা লিখিয়াছেন। রাজার নিজের ভূমির আয় চারি ভাগে বিভক্ত হইত, এক ভাগ হইতে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত, দ্বিতীয় অংশ জায়গীররূপে রাজকর্ম্মচারিগণ অধিকার করিত, তৃতীয় অংশ শাস্ত্রজ্ঞ লোকে ভোগ করিতেন, এবং চতুর্থ অংশ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগকে দান স্বরূপ প্রদত্ত হইত। রাজকর অতি সামান্য ছিল; সকলেই পৈতৃক ভূমি অধিকার ও কর্ষণ করিত এবং রাজার নিকট হইতে বীজ প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে করস্বরূপ প্রদান করিত। নদী ও রাজপথের স্থানে স্থানে মাসুল আদায় হইত। রাজা ইচ্ছা করিলে প্রজাদিগকে উচিত বেতন দিয়া খাটাইতে পারিতেন। শান্তির সময় অল্পমাত্র সৈন্য থাকিত, তাহারা রাজ্যের সীমা রক্ষা করিত, রাজবাটী এবং রাজাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিত; ইহা ভিন্ন যুদ্ধের সময় বহুসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ হইত। শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রী, বিচারকর্ত্তা, সকলেই ভূমি অধিকার করিতেন, এবং তাহারই উৎপন্ন বেতনস্বরূপ ভোগ করিতেন। হুয়েন সাঙ্ হিন্দুদিগের বিচার-প্রণালীর অতিশয় সুখ্যাতি করিয়াছেন।

গ্রীকদিগের ন্যায় হুয়েন সাঙ্ও হিন্দুদিগের সরলতা ও সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দু আচার ব্যবহার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অশোক রাজার সময় হইতে প্রায় আট শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কখনও লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। বরং এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্যের সময়েও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ অতি যত্নে প্রাচীন হিন্দু-অনুষ্ঠান ও নিয়মাদি সঙ্কলন করেন। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে প্রাচীন "ধর্ম্মসূত্র" সমূহের কথা লিখিয়াছি, সেই ধর্ম্মসূত্র হইতে প্রসিদ্ধ মনুসংহিতা নামক গ্রন্থ এক্ষণে সঙ্কলিত হইল।

মনু প্রাচীন চারিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশ্যগণ নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিত, কিন্তু সেই সেই ব্যবসায়মূলক ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয় নাই। কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক্, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, গোপ, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি আধুনিক নানা জাতি মনুর সময়ে সংগঠিত হয় নাই। এই সকল বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বিগণ সে সময়ে বৈশ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইত।

এই চারি জাতি ভিন্ন মনু অনেক মিশ্র জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা প্রায় সমস্তই অনার্য্য জাতি। যথা—নিষাদ, চণ্ডাল, মাগধ, বৈদেহক, ঝাল্লা, মাল্লা, কৈবর্ত্ত ইত্যাদি। অনার্য্যগণ দলে দলে হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া মিশ্রজাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। কায়স্থ, বৈদ্য, বণিগাদি আধুনিক জাতি বৈশ্য সন্তান; ইহারা মনুর লিখিত মিশ্রজাতি নহে।

তৎকালের দণ্ডবিধি, কার্য্যবিধি, ফৌজদারী ও দেওয়ানীবিধি, বিবাহ, স্ত্রীধন, উত্তরাধিকারিত্ব, ঋণ, সুদের হার, কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিধানগুলি মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডবিধির একটি দোষ ছিল, ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলে লঘু শাস্তি, শূদ্র অপরাধ করিলে গুরু শাস্তি দেওয়া হইত। শূদ্রের প্রতি বিধিগত নিষ্ঠুরতা, শূদ্রকে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে ও ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণে অধিকার না দেওয়া,—প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার একটি মহৎ কলঙ্ক। গৌতমবুদ্ধ হিন্দুসভ্যতার এই দোষটি তিরোহিত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, এবং প্রায় আট শত বৎসরের জন্য এ কলঙ্ক ভারতক্ষেত্র হইতে অনেকটা তিরোহিত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে নারীগণ চিরকালই সম্মানিতা; মনুসংহিতায়ও নারীগণকে বিশেষ সম্মান করিবার বিধান আছে। তথাপি কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন নিয়মগুলি পরিবর্ত্তন হইতে ছিল, মনুর গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, মনুর সময়ে সে প্রথা একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই; কিন্তু বিধবার বিবাহ না করাই ভাল, এইরূপ মত দেখা যায়। পূর্ব্বকালে নারীগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে বিবাহ করিতেন, মনুর সময়ে কখন কখন বাল্যকালেই রমণীদিগের বিবাহ হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েকটি কুপ্রথা মনুর সময় হইতেই আরম্ভ হইল। তথাপি মনুর গ্রন্থেও সতীদাহের গর্হিত প্রথার কোনও নিদর্শন দেখা যায় না। সে কথাটী আরও আধুনিক।

ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি কতক কতক

পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, মনুর গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যজ্ঞকর্ত্তা নিজ গৃহে বৈদিক নিয়মানুসারে যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনু এইরূপ বিধান দিয়াছেন। তথাপি দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেবালয়ের পাণ্ডা ও পুরোহিতগণ জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহার প্রমাণ মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। এ প্রকারের পুরোহিত ও পাণ্ডাদিগকে মনু যথেষ্ট ঘৃণা করিতেন, এবং তিনি তাহাদিগকে মাংস ও মদিরা বিক্রেতার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের অবনতি একবার আরম্ভ হইলে সে অবনতির প্রতিরোধ হইল না। মনু যে বৈদিক যাগ যজ্ঞ কার্য্যের বিধান দিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; এবং মনু যে দেবালয় ও দেবালয়ের পুরোহিতদিগকে ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন,—তাহারাই আধুনিক সময়ের হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বেসর্ব্বা।

মনু পারিবারিক ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, এবং নারীগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুদিগের এ কথাগুলি স্মরণ রাখা বিধেয়।

"যে সংসারে নারীগণ সম্মানিতা তথায় দেবগণ পরিতুষ্ট থাকেন। যে সংসারে নারীগণ সম্মানিতা না হয়েন তথায় সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান অফলপ্রদ হয়।"

"যে সংসারে নারীগণ কষ্ট পায় সে সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যে সংসারে নারীগণ সুখে থাকে সে সংসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"যাঁহারা সমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা যেন নারী-গণকে সর্ব্বদা অলঙ্কার, সুপরিচ্ছদ ও সুখাদ্য দান করেন, এবং উৎসব ও আনন্দের সময় তাঁহাদিগকে সমুচিতরূপে বিভূষিত করেন।"

"যে সংসারে পতি ভার্য্যার প্রণয়ে তুষ্ট, সে সংসার কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পৌরাণিক কাল।

অনুমান ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

বিক্রমাদিত্য ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাটগণ। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে বহু শতাব্দী অবধি বিদেশীয় আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয় ও অধিকার করিতে লাগিল। গ্রীক, ইউচি, কাম্বোদীয় হূন, শক, প্রভৃতি আক্রমণকারিগণ পঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। অবশেষে খৃষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর রাজা মহাবল পরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্য করুরের যুদ্ধক্ষেত্রে শকদিগকে পরাস্ত করিয়া হিন্দু-বীরত্বের গৌরব রক্ষা করিলেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। বিক্রমাদিত্যের

গৌরবের কথা হিন্দুগণ এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই, হিন্দু ইতিহাসে তাঁহার নাম এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং বত্রিশসিংহাসন, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি উপন্যাস হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল হিন্দুই বিক্রমাদিত্যের নাম অবগত আছেন। তাঁহার সময় হইতে ভারতবর্ষে জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানশাস্ত্র, কাব্য ও নাটক, এবং নববলে বলিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম যে উৎকর্ষ লাভ করে তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

বিক্রমাদিত্য অনুমান ৫১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, এবং তাঁহার একজন অমাত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের রাজা করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন যে এই মাতৃগুপ্তই কবিপ্রধান কালিদাস। বিক্রমাদিত্যের পর কতিপয় নরপতি রাজত্ব করিলে পর অনুমান ৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নামা শীলাদিত্য সম্রাট্ হইয়া অনুমান ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিও বিক্রমাদিত্যের ন্যায় প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন। কান্যকুব্জে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহারই রাজত্বকালে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শীলাদিত্য সকল জাতিকে জয় করিয়াছিলেন বটে কিন্তু দক্ষিণদেশের মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

শীলাদিত্যের পরে কতিপয় রাজা রাজত্ব করিলে পর, অনুমান ৭০০ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মন্ কান্যকুব্জের সম্রাট্ হইলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলে কাশ্মীরের প্রবলপ্রতাপশালী রাজা ললিতাদিত্যের নিকট পরাস্ত হইলেন

তাঁহার সময়ের পরবর্ত্তী সময় হইতে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস পাওয়া যায় না।

যে সময়ে বিক্রমাদিত্য ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণ উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে সৌরাষ্ট্র, অর্থাৎ গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশে বল্লভীগণ একটি পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে সে বংশেরও লোপ হইল, এবং তাহার পর হইতে ঐ রাজ্যের ইতিহাস আর পাওয়া যায় না।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম। সম্রাট্‌ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুবল যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কাব্য প্রভৃতিরও উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিল। মনু-সংহিতায় যে বৈদিক যাগ যজ্ঞের সংরক্ষণের চেষ্টা লক্ষিত হয়, জন সাধারণের মধ্যে সে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রায় লোপ হইয়া গেল। গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহে যজ্ঞাগ্নি আর রাখিতেন না, এবং নানারূপ শ্রৌত ও গৃহ্য যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন না। পক্ষান্তরে মনুসংহিতার যে দেবালয় ও দেবালয়ের পাণ্ডা প্রভৃতির নিন্দা দেখা যায়, সেই সকল লইয়া নূতন হিন্দু ধর্ম্ম গঠিত হইল। প্রজাগণ নিজ গৃহে যাগ যজ্ঞ না করিয়া, দেবালয়ে দেবমূর্ত্তি সমূহের নিকট পূজাদি দিতে আরম্ভ করিল; সুতরাং দেবমন্দিরের পুরোহিতদিগের প্রাধান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মনুসংহিতায় ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবগণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহাদিগের

পৌরাণিক আকারে হিন্দুদিগের প্রধান আরাধ্য দেবতা হইলেন; লক্ষ্মী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবীগণ জনসাধারণের উপাসনার ভাজন হইলেন; রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ ও বলরাম, গণেশ ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি অসংখ্য পৌরাণিক দেবগণ, উপাসক জনসাধারণের আরাধ্য দেবতা হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে বৈদিক যাগ যজ্ঞ দেশে প্রায় লোপ হইয়া গেল; ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবগণ নিম্ন শ্রেণীর দেবতা হইলেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহাদের পৌরাণিকরূপে দেবতাদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিলেন, বেদের অপরিচিত অনেক দেব দেবী পূজার ভাজন হইলেন এবং দেবালয় সংস্থাপন ও মূর্ত্তিপূজাই আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অংশ হইয়া উঠিল।

জ্যোতিষাদি শাস্ত্র। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে আধুনিক হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রণেতা আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং "আর্য্যভট্টীয়" "দশগীতিকা" ও "আর্য্যাষ্টক" নামক পুস্তকাবলী রচনা করিয়া নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি স্থির আছে, পৃথিবী প্রতিদিন আবর্ত্তন করিতেছে, সেইজন্য সূর্য্যাদির উদয় অস্ত লক্ষিত হয়—একথা আর্য্যভট্টই আবিষ্কার করিয়া যান। আর্য্যভট্টের পর বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" সভার একজন প্রধান রত্ন ছিলেন। তিনি বৃহৎ সংহিতা নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বের ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ সমূহ একত্র সঙ্কলন

করিয়া "পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। তাঁহার পর "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা রচয়িতা এবং ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে প্রচারিত হয়।

উপরি উক্ত গ্রন্থ সমূহে কেবল জ্যোতিষ শাস্ত্র নহে, বীজগণিত শাস্ত্রেরও বিশেষ অনুশীলন করা হইয়াছিল। ফলতঃ বীজগণিত শাস্ত্রে হিন্দুগণ যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, জগতের মধ্যে প্রাচীন কোন জাতিই সেরূপ লাভ করেন নাই। খৃষ্টের পর অষ্টম শতাব্দীতে একজন আরবদেশীয় পণ্ডিত হিন্দুদিগের বীজগণিতের পুস্তক অনুবাদ করিয়া, আরবদিগের মধ্যে প্রচার করেন। পরে ১২০২ খৃষ্টাব্দে পিসা নগরবাসী একজন ইতালীয় আরবদিগের নিকট এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ইউরোপে প্রচার করেন। তথাপি বার শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ যে সমস্ত বীজগণিত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইউরোপে দুই কি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার অনেকগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই।

এইরূপে ত্রিকোণ ও গোলাকার পদার্থের যে সমস্ত নিয়মাদি প্রাচীনকালের হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপে তাহার অনেক গুলিই গত দুই কি তিন শত বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অঙ্কবিদ্যায় হিন্দুগণ জগতের গুরু। তাঁহারা যে দশাত্মক প্রথা (Decimal Notation), আবিষ্কার করেন, তাহাই এক্ষণে সমস্ত জগতে প্রচলিত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ এটি জানিতেন না, সুতরাং অঙ্কবিদ্যায় হিন্দুদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

পক্ষান্তরে জ্যামিতিশাস্ত্রে যদিও হিন্দুগণ প্রথমে নিয়মাদি আবিষ্কার করেন, তথাপি ভারতবর্ষে সে শাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ দৃষ্ট হয় নাই। যখন যাগ-যজ্ঞের প্রথা উঠিয়া গেল, তখন বেদি নির্ম্মাণের জ্যামিতিমূলক নিয়ম আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা রহিল না। বিশেষতঃ বীজগণিত দ্বারাই হিন্দুগণ জ্যামিতির অনেকগুলি সিদ্ধান্ত প্রমাণীকৃত করিতে লাগিলেন, জ্যামিতির প্রতি ততদূর যত্ন রহিল না। গ্রীকগণ এ শাস্ত্রে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও গ্রীকগণ অনেক দূর উৎকর্ষ লাভ করেন এবং আর্য্যভট্টাদি হিন্দুজ্যোতির্ব্বেত্তা অনেক বিষয়ে গ্রীকদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আকাশে সূর্য্যের পথটি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মেষ, বৃষ, মিথুনাদি যে রাশিচক্র স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা গ্রীকগণ কাল্ডীয়দিগের নিকট হইতে এবং হিন্দুগণ গ্রীকদিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন।

চিকিৎসা শাস্ত্র। চিকিৎসা শাস্ত্রে ধন্বন্তরি নামক পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" সভার একটি রত্ন ছিলেন। চরক ও সুশ্রুত নামক দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থ বোধ হয় পৌরাণিক কালেই রচিত হয়। উভয় চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। ধাতু সেবন দ্বারা পীড়া আরোগ্য করা, তাঁহারাই প্রথমে আবিষ্কার করেন। অতি পূর্ব্বকালেই হিন্দুদিগের ১২৭ প্রকার ভিন্ন

ভিন্ন যন্ত্র ছিল। তাঁহারা নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতেও পারিতেন। বসন্তরোগ নিবারণার্থ টিকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে।

কাব্য ও নাটক। জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের উৎকর্ষের জন্য বিক্রমাদিত্যের কাল যেরূপ প্রসিদ্ধ, কাব্যোদ্দীপনার জন্যও ঐকাল তদপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। ফলতঃ কালিদাসের কবিত্বই বিক্রমাদিত্যের যশোরাশির একটি প্রধান হেতু-স্বরূপ। কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত নাটক আর একখানিও নাই; উহার ন্যায় সুললিত মধুর নাটকও জগতে আর নাই। পাঠ করিলে বোধ হয় যেন সে মধুরতা পুস্তকে ধরে না, যেন পত্রে পত্রে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সে মধুরতা উথলিয়া পড়িতেছে। কণ্বমুনির শান্ত আশ্রমে বল্কলবাসিনী শকুন্তলা, তাঁহার বনবাসিনী সঙ্গিনীগণ, হরিণী, বনলতা, পুষ্পচারা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, তাঁহার সরল শান্ত হৃদয়ের প্রথম অজ্ঞাত অব্যক্ত উদ্বেগ, তাঁহার চিরসঙ্গিনী-দিগের নিকট হইতে খেদপূর্ণ বিদায় গ্রহণ প্রভৃতি যে সমস্ত চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত আছে, সেরূপ ললিত, মধুর, হৃদয়-গ্রাহী চিত্র আমরা কখনও কোন ভাষায় দৃষ্টি করি নাই। শকুন্তলা ভিন্ন কালিদাসের আর দুইখানি নাটক এখনও বিদ্যমান আছে। সে নাটকদ্বয়—বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকা-গ্নিমিত্র। এই দুই খানিতে, বিশেষতঃ বিক্রমোর্ব্বশীতে, কালিদাসের কল্পনার অতুল্য লীলা, কালিদাসের লেখনীর অসাধারণ মধুরতা দৃষ্ট হয়।

পুরূরবা রাজার স্বর্গীয় অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত প্রণয়,

ও অগ্নিমিত্র রাজার সহিত রাজ্ঞী ধারিণীর এক জন পরিচারিকা মালবিকার সহিত প্রণয়, এই দুই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার উল্লেখ আছে।

নাটক ভিন্ন কালিদাস অন্য কাব্যও কতকগুলি লিখিয়াছেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত কালিদাসবিরচিত; ঋতুসংহার ও নলোদয় কালিদাসের রচিত কি না সন্দেহ। রঘুবংশে রাজাদিগের কীর্ত্তি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে; কুমারসম্ভবে উমার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে মহাদেবের তপঃ ও উমার সেবা, পরে নির্জ্জন বনে উমার কঠোর তপঃ ও শোক অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘদূতে দেশবর্ণনার চতুরতা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়।

কালিদাসের সময়ের কিছু পরেই বোধ হয় ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করেন। কালিদাসের ন্যায় ভারবির কল্পনা ক্ষমতা নাই, উপমাচাতুর্য্য নাই, রচনালালিত্যও নাই, কিন্তু তথাপি ভারবির রচনা অতিশয় তেজস্বিনী, ভাবও তেজঃপূর্ণ। হিমালয় পর্ব্বতে অর্জ্জুন কঠোর তপস্যা করেন, পরে কিরাতবেশধারী মহাদেবের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া দিব্য অস্ত্র লাভ করেন, এই গল্প অবলম্বন করিয়া কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্য খানি রচিত হইয়াছে।

৬১০ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শীলাদিত্য সম্রাট্ ছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রারম্ভেই দণ্ডিন্ দশকুমারচরিত নামক সুন্দর উপন্যাস লিখেন এবং তাহার পর বাণভট্ট ও সুবন্ধু কাদম্বরী

ও বাসবদত্তা নামক উপন্যাসদ্বয় রচনা করেন। এই সকল উপন্যাসের গদ্যরচনা তেজঃপূর্ণ, তীব্র ও নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, কিন্তু সহজ স্বাভাবিক ভাষায় যেরূপ গদ্য রচনা হয় তাহা সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় না।

এই শীলাদিত্যের রাজত্বকালে ভর্তৃহরি তাঁহার তিনটি শতক রচনা করিয়াছিলেন। শতক গুলি ভাবপূর্ণ এবং রচনা চাতুর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ভট্টিকাব্য নামক যে কাব্যাকারে ব্যাকরণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় ভর্তৃহরির রচিত।

শীলাদিত্য, (যাঁহার অন্য নাম হর্ষদেব) স্বয়ং রত্নাবলী নাটক এবং নাগানন্দ নামক বৌদ্ধনাটক রচনা করিয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে; কিন্তু রত্নাবলী বোধ হয় কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্টের রচিত এবং নাগানন্দও বোধ হয় রাজসভার অন্য কোনও পণ্ডিত কর্তৃক রচিত। বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে সম্রাট্ শীলাদিত্যের একখানি জীবন চরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

অনুমান ৭০০ হইতে ৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যশোবর্ম্মন্ কান্যকুব্জের সম্রাট্ ছিলেন। যশোবর্ম্মনের রাজত্ব কালে বিদর্ভদেশজাত জগদ্বিখ্যাত কবি ভবভূতি তাঁহার নাটক সমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

ভবভূতির মালতীমাধব অতি প্রসিদ্ধ নাটক। কালিদাসের লেখনী যেরূপ মধুময়ী, মালতীমাধব-রচয়িতার লেখনীও সেইরূপ তেজস্বিনী। বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্টরক্ষিত চামুণ্ডার মন্দিরে মালতীকে যখন বলি দিবার উদ্যোগ

করিল,—মাধব যখন ভীষণ যুদ্ধের পর অঘোরঘণ্টকে নিহত করিয়া মালতীর উদ্ধার সাধন করিলেন, সেই স্থানের বর্ণনার ন্যায় তেজস্বিনী, ভয়াবহ বর্ণনা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। পুনরায় একবার কপালকুণ্ডলা মালতীকে লইয়া যায়, কিন্তু সৌদামিনীর সহায়তায় মাধব পুনরায় তাঁহার উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই নাটকে বৌদ্ধ রমণী কামন্দকীর পরিচয় আছে। এই নাটক ভিন্ন ভবভূতি আরও দুইখানি নাটক লিখিয়াছেন। মহাবীরচরিতে রামায়ণের যুদ্ধ ও সীতা উদ্ধারের বর্ণনা আছে, উত্তররাম-চরিতে সীতার বনবাস বর্ণিত আছে। এই দুই নাটকই হৃদয়গ্রাহী, তন্মধ্যে উত্তররামচরিত বিশেষ করুণরসপূর্ণ।

ভারতবর্ষে পুরাণ নামক গ্রন্থ অতি প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রাচীন পুরাণগুলি এক্ষণে নাই। এক্ষণে যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই পৌরাণিক-কালে রচিত। পুরাণগুলি বেদব্যাসের রচনা বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে তাহা মিথ্যা। খৃষ্টের ১৪০০ অথবা ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ সঙ্কলিত হয় এবং খৃষ্টের ৫০০ কি ৬০০ বৎসর পর আধুনিক পুরাণগুলি রচিত হয়। মধ্যে ২০০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল।

মহাভারত ও রামায়ণ অতি পুরাতন গ্রন্থ, কিন্তু সময়ে সময়ে বহু কবিদ্বারা রূপান্তরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শেষে পৌরাণিক কালে ঐ গ্রন্থদ্বয় যে আকার ধারণ করে আমরা সেই আকারে উহা দেখিতে পাই। কৃষ্ণ ও রামচন্দ্র দেবতার অবতার বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ জানিতেন না,

মনুসংহিতায়ও তাঁহাদের নাম নাই। এটি আধুনিক কল্পনা এবং এই আধুনিক কল্পনা পৌরাণিককালে মহাকাব্যদ্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কালিদাসের সময় হইতে ভবভূতির সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ অনুমান ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কবি, জ্যোতির্ব্বেত্তা, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক পরম্পরায় সুশোভিত ছিল। এই দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুপ্রতিভার আলোক চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পর সে আলোক যেন সহসা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে একটি প্রতিভা সম্পন্ন হিন্দুনাম পাওয়া যায় না।

রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব। ইহার কারণ কি? ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস শূন্য কেন? বিক্রমাদিত্য, শীলাদিত্য, যশোবর্ম্মন্ প্রভৃতির ন্যায় আর কোনও মহান্ নরপতি এই ২৫০ বৎসরের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শন নাই। কালিদাস, বাণভট্ট ও ভবভূতির ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন কবি এই দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে আর জন্মেন নাই। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় জ্যোতির্ব্বেত্তা এ দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। অমরসিংহ, বররুচি, ধন্বন্তরি প্রভৃতির ন্যায় রত্ন এ দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে আর দৃষ্ট হয় নাই। কোন মহৎ রাজ্য বা মহৎ জাতির বা সমৃদ্ধিশালী নগরের কথা এ দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে শুনিতে পাই না। এ দুই তিন শত

বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ের কোন ইতিহাসও পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি?

কারণ আমরা অনুভব করিতে পারি। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে একটি মহৎ রাজবিপ্লব ঘটিতেছিল। খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে যেরূপ নববলে বলিষ্ঠ মগধরাজগণ প্রাচীন কোশল, বিদেহ, পঞ্চাল, কুরু প্রভৃতি জাতিকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত একচ্ছত্র করিয়াছিলেন, সেইরূপ খৃষ্টের পর ৭৫০ হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন ও হীনবল সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়া নববলে বলীয়ান রাজপুতগণ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হইল! এ রাজপুতগণ কে? কোথা হইতে আসিল? কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে বহু শতাব্দী অবধি যে শক আদি বিদেশীয় আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল,—রাজপুতগণ তাহাদিগেরই সন্তান। সে যাহা হউক, প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে রাজপুতদিগের নাম পাওয়া যায় না, পৌরাণিককালের শেষে তাহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইল! অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব, দিল্লী, আজমীর, কান্যকুব্জ ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে রাজপুতগণই অধীশ্বর, রাজপুতগণই বীর ও যোদ্ধা, রাজপুতগণই সর্ব্বে সর্ব্বা।

এই রাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে একটি ধর্ম্মবিপ্লবও ঘটিয়াছিল বিক্রমাদিত্য শীলাদিত্য প্রভৃতি মহান্ সম্রাট্‌গণ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে সমান সমাদর করিতেন। তাঁহাদের সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ছিল না। এক রাজা

হিন্দু, তাঁহার পুত্র বৌদ্ধ হইতেন, কখন বা এক সংসারে এক ভ্রাতা হিন্দু অন্য ভ্রাতা বৌদ্ধ হইতেন। বিক্রমাদিত্য হিন্দুকবি কালিদাস ও বৌদ্ধ অভিধানলেখক অমরসিংহকে সমান আদর করিতেন; শীলাদিত্য হিন্দুনাটক রত্নাবলী এবং বৌদ্ধনাটক নাগানন্দ প্রণয়ন করিলেন বা করাইলেন; কিন্তু যখন রাজপুতগণ ভারতের অধীশ্বর হইলেন তখন আর এ ভাব রহিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসসাধন করা তখন হিন্দু পুরোহিতদিগের উদ্দেশ্য হইল; তাঁহারা নববিজেতা রাজপুতগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মানিয়া লইলেন এবং সূর্য্যবংশের সন্তান বলিয়া সম্মানিত করিলেন। রাজপুতগণও এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ও হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তারে যত্নবান্ হইলেন। নগরে নগরে প্রদেশে প্রদেশে বৌদ্ধমঠ বিলুপ্ত হইল, বৌদ্ধপুরোহিতগণ বিতাড়িত হইলেন, আর্য্যাবর্ত্ত হিন্দুদেবালয়ে পূর্ণ হইল। গজনীর অধিপতি মাহমুদ যখন খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাঁহার সময়ের মুসলমান পণ্ডিত আল্‌বিরূণী যখন ভারতবর্ষে বাস করিয়া হিন্দুদিগের শাস্ত্রাদি ও আচার ব্যবহার শিক্ষা করেন, তখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত রাজপুত রাজা ও হিন্দুদেবালয়ে পূর্ণ, —বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায়!

সামাজিক বিপ্লব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাতিবৈষম্য প্রথা প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কলঙ্ক। শূদ্রের লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড, ব্রাহ্মণের গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড, এটি হিন্দুসভ্যতার কলঙ্ক। শূদ্রদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে ও যাগযজ্ঞ সম্পাদনে অধিকার না থাকা হিন্দু সভ্যতার কলঙ্ক।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গুণশূন্য হইলেও সম্মানার্হ, বৈশ্য ও শূদ্র গুণী হইলেও সমাজের চক্ষে নীচ, এ প্রথাটিও হিন্দু সভ্যতা-কালের কলঙ্ক।

এই দোষ হইতে বিষময় ফল ফলিয়াছে। যে সকল শিল্পাদিতে বৈশ্য ও শূদ্রগণ রত থাকিত, সে সমস্ত শিল্পাদি ভারতবর্ষে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। অপেক্ষাকৃত অসভ্য আরবগণ সমুদ্রপথে যেরূপ গমনাগমন করিত, সভ্য হিন্দুগণ ততদূর পারিত না। গৃহনির্ম্মাণ, পোতনির্ম্মাণ, দুর্গনির্ম্মাণ, সেতুনির্ম্মাণ, গৃহস্থের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ, নানারূপ যন্ত্রাদিনির্ম্মাণ, ভাস্করকার্য্য ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যে গ্রীক ও রোমকগণ সেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, চিন্তাপটু হিন্দুগণ সেরূপ উৎকর্ষ লাভ করেন নাই।

জাতিবিচ্ছেদ ইহার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষের প্রভু, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাঁহাদিগের অধীন, যুগে যুগে কখনও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে নাই, ভরসাও করে নাই। স্বাধীনতা ও পরাক্রমের সহিত মনোবৃত্তি গুলি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, অধীনতায় সে গুলি নষ্ট হইয়া যায়। স্বাধীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ চিন্তা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিল এবং সেই সেই বিষয়ে যে পারদর্শিতা লাভ করিল, জগৎ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু পদ-দলিত হীন বৈশ্য ও শূদ্রগণ শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিল, বৎসরে বৎসরে যুগে যুগে ব্রাহ্মণাদেশে সেই কার্য্য করিতে লাগিল, কিন্তু মনের স্বাধীনতা নাই, হৃদয়ের বেগ নাই, সে অসংখ্য কার্য্যের কল্পনায় পরিচয় নাই। ব্রাহ্মণাদেশে

তাহারা মন্দির ও দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, রাজাদেশে প্রাসাদ, দুর্গ ও প্রাচীর প্রস্তুত করিত, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনে মনের যে উৎকর্ষ সাধন হয়, তাহা হইল না। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতে শিখিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ বা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শিখিল, কিন্তু সে কার্য্যে বিশেষ কল্পনা বা চিন্তার পরিচয় নাই। ফীডিয়াস বা প্রাক্‌সিলীটীস গ্রীসে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মাইকেল এঞ্জিলো বা রাফেল ইতালীতে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সে সম্মান ও সে পূজা চিন্তাপটু বা অস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দিগের জন্য, শিল্পব্যবসায়ীদিগের জন্য নহে। সুতরাং শিল্পব্যবসায়িগণও পরাধীনতা বশতঃ কখনও সে সম্মানের যোগ্য হইতে পারিল না।

সকল দেশেই বিদ্যা ও অস্ত্রব্যবসায়ী লোক, অন্য লোক অপেক্ষা প্রভুত্ব লাভ করে; কিন্তু সেই প্রভুত্বটি বংশানুগত হইলে অনিষ্ট ফল ফলে। সমাজের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে; সামান্য ব্যবসায়ী লোকগণ জন্মহেতুই আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিতে শিখে, সুতরাং কখনও উন্নত হইতে পারে না। উচ্চ ব্যবসায়ী লোক জন্মহেতুই আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিতে শিখে, সুতরাং নীচ লোকদিগের উপর অত্যাচার করে ও আপনাদিগের ক্ষমতা রক্ষার জন্য অন্যায় উপায় উদ্ভাবন করে। ইউরোপে যে সমস্ত আবিষ্কার দ্বারা আধুনিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি অতি সামান্য লোকে করিয়াছে; ভারতবর্ষে সেটি নিষিদ্ধ; কয়েক সহস্র বৎসরের

মধ্যে সামান্য লোকের চিন্তাশক্তি বা কার্য্যপরম্পরার চিহ্ন নাই। স্বাধীনচিন্তা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের একচাটিয়া: স্বাধীনচিন্তা নিম্নশ্রেণীর লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ।

একজাতি প্রভু ও অন্যজাতি দাস হইলে কেবল যে দাস জাতির অমঙ্গল হয়, তাহা নহে, প্রভুদিগেরও অমঙ্গল হয়। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আপনাদিগের প্রভুত্ব রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকাতে সত্যের জন্য ততটা উৎসাহী ছিলেন না; জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্রে যত দূর উন্নতি লাভের সম্ভাবনা ছিল, তত-দূর হইয়া উঠিল না। সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণপ্রভুত্ব স্থিরীকৃত করিবার চেষ্টায় প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা হ্রাস পাইল। এইরূপে জাতিবিচ্ছেদ হিন্দুসভ্যতা ও বিদ্যার গতি অনে-কাংশে রুদ্ধ করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আবার যখন বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত তখন হিন্দুগণ নৈসর্গিক সাহসসত্বেও জাতিবৈষম্য বশতঃ সমুচিত উপায় বিধান করিতে পারিত না। যুদ্ধ ও স্বদেশ রক্ষা কেবল ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা, জনসাধারণে যুদ্ধ শিখিল না, স্বদেশগৌরব বুঝিল না, স্বদেশ রক্ষার উপায় জানিল না। ইউরোপে জনসাধারণই দেশের বল, দেশের বিপদ্ উপ-স্থিত হইলে সমস্ত দেশবাসী রোষে গর্জ্জিয়া উঠে। ভারত-বর্ষে ক্ষত্রিয়গণ বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিবেন বলিয়া শূদ্র ও বৈশ্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিল। গ্রীক, ইউচি, হূন এবং শকগণ বার বার আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিতে লাগিল।

আবার যখন বিদেশীয় শত্রু নাই তখন দেশের রাজ-কার্য্যে শূদ্র ও বৈশ্যগণের কিছুমাত্র অধিকার ছিল না।

ইউরোপে অনেক প্রাচীন রাজ্যে সাধারণতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল, সকল দেশেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে প্রজাদিগের মত দিবার অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ স্বতঃই রাজকার্য্যে অধিকারী, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে বা মত প্রকাশ করিবে তাহার উপায় ছিল না। ভারতবর্ষের প্রজা বলহীন, ক্ষমতাহীন, শান্ত ও নির্জ্জীব। তাহাদিগের রাজনৈতিক সভা কখনও ছিল না, স্বদেশের রাজকার্য্য রাজনীতি সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন ও জ্ঞানহীন। এইরূপে প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের জাতিবৈষম্য হইতে শিল্পকার্য্যে, বিদ্যালোচনায়, যুদ্ধবিষয়ে ও রাজকার্য্যবিষয়ে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছিল। পৌরাণিককালের শেষে ঐ জাতিবৈষম্য যে আকার ধারণ করিল তাহাতে ঐ অমঙ্গল দশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

যত দিন হিন্দুগণ নিজ নিজ গৃহে যজ্ঞ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, ততদিন সামান্য প্রজা অর্থাৎ বৈশ্যদিগেরও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল। পৌরাণিককালে যখন যাগ যজ্ঞের লোপ হইল, যখন দেবালয়ের ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন, তখন বৈশ্যগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ প্রাচীন অধিকারটি হারাইল; তখন বৈশ্য ও শূদ্রে বড় বিভিন্নতা রহিল না। একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান পণ্ডিত আল্ বিরুণী ভারতবর্ষে অনেক কাল বাস করিয়া ভারতবাসীদিগের বিষয় অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বৈশ্যগণ প্রায় শূদ্রের ন্যায় হীন, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে অক্ষম হইয়াছিল। যে দেশের

জনসাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অক্ষম, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে অনধিকারী, রাজনৈতিক বিষয়ে অজ্ঞ, যুদ্ধ ব্যবসায়ে বিরত, সে দেশের অবনতি অনিবার্য্য।

প্রজাদিগের আরও হীন দশা ঘটিল। মনুর সময় পর্য্যন্ত জনসাধারণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও এক বৈশ্য জাতি ভুক্ত ছিল। এক্ষণে সেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা গুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িল, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও আচার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, এবংএইরূপ অস্বাভাবিক অনৈক্য বশতঃ সমগ্র হিন্দুজাতি অধিকতর হীন বল হইয়া পড়িল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রচলিত ভাষারও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সিন্ধুতীরবাসী আদিম হিন্দুগণের ঋগ্বেদের সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। গঙ্গাতীর বাসী প্রাচীন কুরু, পঞ্চাল, কোশল এবং বিদেহগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেন, সেই সংস্কৃত ভাষায় তৎকালের ব্রাহ্মণ উপনিষদাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অশোক রাজার সময় জনসাধারণে পালিভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, সে পালিভাষা সংস্কৃত ভাঙ্গা, এবং অনেকটা সংস্কৃতের ন্যায়। বিক্রমাদিত্য রাজার সময়ে জনসাধারণে নানারূপ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিত; সে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার আমরা কালিদাসের নাটকে দেখিতে পাই। তাহার পর, ভারতবর্ষের রাজপুতগণ প্রাধান্য লাভ করিলে পর, খৃষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রচলন হইল।

ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের কথা। কাশ্মীররাজ্য। কাশ্মীর রাজ্যের একখানি প্রাচীন ইতিহাস আছে, উহার নাম "রাজ-

তরঙ্গিণী", এবং কহ্লনপণ্ডিত উহার প্রণেতা। খৃষ্টের অনতি পরই কনিষ্ক নামক বিদেশীয় রাজা কাশ্মীর রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এবং তাহার পাঁচশত বৎসর পর বিক্রমাদিত্যের সাহায্যে কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন তাহাও বিবৃত হইয়াছে। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন ভারতবর্ষে হিন্দুস্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় তাহার পরও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করেন।

গুর্জ্জরদেশ। যে সময়ে উজ্জয়িনীনগরে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন, অনুমান সেই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত বল্লভীগণ গুর্জ্জর ও সৌরাষ্ট্র দেশে রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ বংশ "সেন" বংশ নামে খ্যাত, এবং অনুমান সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্রে রাজত্ব করেন। চীনভ্রমণকারী হুয়েন সাঙ্ তাঁহাদের রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন। অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশ বিলুপ্ত হয় এবং রাজপুতগণ অহ্নলওয়ারা অথবা পত্তনে রাজধানী স্থাপন করেন।

দক্ষিণাপথ। উত্তরে নর্ম্মদানদী ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর অন্তর্গত যে বিস্তীর্ণ প্রদেশখণ্ড আছে তথায় চালুক্য বংশীয় রাজগণ দুইটি বিস্তীর্ণ ও পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়া অনুমান সাত শত বৎসর, অর্থাৎ ৫০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ দুইটি রাজ্যের মধ্যে একটি পূর্ব্বদিকে। ওয়ারঙ্গল নামক নগর উহার রাজধানী। অপরটি পশ্চিমদিকে, অর্থাৎ আধুনিক মহারাষ্ট্র ও কঙ্কন দেশ লইয়া ব্যাপ্ত।

আবার কৃষ্ণার দক্ষিণে চের, চোল ও পাণ্ড্য নামক তিনটি অতি প্রাচীন রাজ্য ছিল। ঐ দেশবাসিগণ প্রাচীন দ্রাবিড়জাতীয় কিন্তু ক্রমশঃ হিন্দুদিগের নিকট হইতে হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল। অশোক রাজার সময়ে এই রাজ্য গুলি বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে পৌরাণিককালে চোলরাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী নগরী শাস্ত্রালোচনা ও বিদ্যাগৌরবের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

উড়িষ্যা। পূর্ব্বদিকে উড়িষ্যা প্রদেশও অতিপ্রাচীন কালে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। অশোক রাজার সময়ের পূর্ব্বেই বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ উড়িষ্যায় আগমন করিয়া খন্দগিরি প্রভৃতি স্থানে যে গিরিগহ্বর নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বৌদ্ধ রাজগণ অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। অবশেষে খৃষ্টের পর ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে কেশরীবংশ উড়িষ্যার রাজা হইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম, বিশেষতঃ মহেশ্বর বা ভুবনেশ্বরের পূজা প্রচার করেন। ভুবনেশ্বর নামক নগরে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি স্বরূপ অসংখ্য প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কালক্রমে মহেশ্বরের উপাসনার হ্রাস হইল এবং কৃষ্ণ বা জগন্নাথের উপাসনা উড়িষ্যায় প্রচারিত হইল। সুতরাং উড়িষ্যার অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির গুলি সমস্তই জগন্নাথের, এবং জগন্নাথ বা শ্রীক্ষেত্রে যে মন্দির আছে তথায় ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ হইতে অদ্যাপি লক্ষ লক্ষ হিন্দু গমন করেন।

কেশরী বংশের পর গঙ্গাবংশীয় রাজগণ ১১৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইহার কিছু পর মুসলমানগণ উড়িষ্যা জয় করে।

বঙ্গদেশ। খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন মগধ রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে, তখন অঙ্গরাজ্য (আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রদেশ) বিলক্ষণ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল; এবং তথা হইতে হিন্দু সভ্যতা ক্রমশঃ আরও পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইতে লাগিল। খৃষ্টের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক লেখকগণ বঙ্গদেশের ক্ষমতাশালী রাজাদিগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এবং খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্দ্ধন (অর্থাৎ উত্তর বঙ্গদেশ) সমতট (অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গদেশ) কামরূপ (অর্থাৎ আসাম) এবং তাম্রলিপ্তি (অর্থাৎ তমলুক) প্রদেশ সমূহের সভ্যতা, শাস্ত্রবিদ্যা ও বাণিজ্যের বিস্তীর্ণ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে একটি রাজ্য ছিল না, উপরি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, এবং মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণ-সুবর্ণ নামে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, ও ত্রিপুরায় আর একটি রাজ্য ছিল। কর্ণ-সুবর্ণের রাজা প্রসিদ্ধনামা শীলাদিত্যের পিতাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়াছিলেন তাহাও হুয়েন সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন।

অনুমান ৮৫০ খৃষ্টাব্দে "পাল" নামধারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একটি পরাক্রান্ত বংশ বঙ্গদেশের রাজা হয়েন। ভূপাল বা লোকপাল এই বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার পৌত্র দেবপাল অনেক রাজ্য জয় করিয়া সমুদয় ভারতের সম্রাট্ বলিয়া

কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। দিনাজপুর, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি অনেক স্থানে পালবংশীয় রাজাদিগের অনেক কীর্ত্তি এখনও দেখা যায়; দিনাজপুরের বিখ্যাত মহীপালদীঘি মহীপাল রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে সেনবংশীয় রাজারা পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন; কালক্রমে পাল ও সেনবংশে বিরোধ হইল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যেরূপ, বঙ্গদেশেও সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় ও হিন্দুধর্ম্মের জয় হইল। সেনবংশীয়েরা বঙ্গদেশের রাজা হইলেন। এই বংশের প্রথম রাজা আদিশূর (তাঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন) হিন্দুধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধির জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইলেন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রধান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ এই দশ জনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু এটি অলীক কথা; কেবল দশ জনের এত সন্তান সন্ততি হওয়া সম্ভবপর নহে। কথিত আছে যে এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত নামক কাব্য এবং ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার রচনা করিয়াছিলেন।

কৌলীন্য প্রথা আদিশূর প্রবর্ত্তিত করেন নাই; তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী বল্লালসেন এই প্রথার প্রবর্ত্তক। তিনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রশস্ত রাজ্যকে রাঢ় (বর্দ্ধমানবিভাগ), বরেন্দ্র (রাজসাহী ও কুচ-বিহার বিভাগ) বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ), বাগড়ী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ), এবং মিথিলা (উত্তর বিহার) এই পাঁচ

ভাগে বিভক্ত করেন। এই দেশবিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ হইয়াছে। সুবর্ণগ্রাম, গৌড় এবং নবদ্বীপ এই তিনটি বল্লালের রাজধানী ছিল।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে জয়দেব গীত-গোবিন্দ রচনা করেন; তাঁহার পর মাধবসেন ও কেশব-সেন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। পরে ১১২৩ খৃষ্টাব্দে লাক্ষ্মণেয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই বঙ্গদেশের রাজা হই-লেন। তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি বখ্‌তীয়ার খিল্‌জী নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশের অধিকাংশ জয় করিলেন।

দিল্লী, আজমীর ও কান্যকুব্জ। খৃষ্টের পর অষ্টম শতাব্দীতে এক রাজপুতবংশ দিল্লী প্রদেশ জয় করিয়া ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য শাসন করেন। ঐ বৎসরে আজমী-রাধিপতি চৌহানবংশীয় বিশালরায় দিল্লী জয় করেন; সেই অবধি আজমীর এবং দিল্লী বহুকাল পর্য্যন্ত এক রাজ্যভুক্ত হইয়া থাকে।

আজমীর ও দিল্লী পুনরায় দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইল। দিল্লীতে তোমরকুল ও আজমীরে চৌহানকুল রাজত্ব করিতে লাগিলেন। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর নিঃসন্তান থাকায় আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরায়কে আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিলেন। সুতরাং আজমীর ও দিল্লী পুনরায় এক রাজার অধীন হইল।

আজমীর ও দিল্লীর অধিপতি চৌহান পৃথ্বীরায় পূ। দ্বাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যাকে

পূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন; সেই জন্য দুই রাজার মধ্যে অতিশয় শত্রুতা জন্মে। জয়চন্দ্র মুসলমানদিগকে আহ্বান করেন; কিন্তু পৃথ্বীরায় তিরৌরির যুদ্ধে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীনকে পরাস্ত করিলে, মুসলমানগণ কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দুই বৎসর পরে সাহাবুদ্দীন পুনর্ব্বার পৃথ্বীরায়কে আক্রমণ করিলেন। এবার পৃথ্বীরায় পরাস্ত ও হত হইলেন। সেই বৎসরেই (১১৯৩) দিল্লী ও আজমীর মুসলমান-হস্তগত হইল। তাহার পর বৎসর (১১৯৪) সাহাবুদ্দীন জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া কান্যকুব্জ জয় করিলেন। ইহার অনতি-বিলম্বে মুসলমানগণ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিল।

স্বাধীনতা লোপের সহিত হিন্দুদিগের চিন্তাবল, বিদ্যাবল, কার্য্যবল সমস্ত লোপ হইল। দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভাস্করাচার্য্য লীলাবতী ও বীজগণিত প্রণয়ন করেন। তাহার পর শত বৎসরের মধ্যে জয়দেব বা ভাস্করাচার্য্যের সমকক্ষ লোক ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুসলমান-আক্রমণ ও বিজয়।

৬৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি। আরবদেশ অনু ও মরুভূমিপূর্ণ, সুতরাং বহুপূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাবধি কথ বিশেষ সভ্যতা লাভ করে নাই। আরবের লোক অতি সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু এবং তাঁহাদিগের দেশের দারিদ্র্য আপনাদিগের সাহস বশতঃ কখনও অন্য জাতির অধীন স্বীকার করেন নাই। ৬৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহারাও অন দেশ জয় করিবার উদ্‌যোগ করেন নাই।

আরবগণ পৌত্তলিক ছিলেন। তাঁহারা নক্ষত্র পূজা কি তেন, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লো আরবদেশে আসিয়া বাস করাতে উক্ত ধর্ম্মও ক্রমে ক্র আরবে প্রচারিত হইল।

মহম্মদ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরিচয় পাইলেন এবং ঐ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাইলেন। তিনি বাল্যাবধি অতিশয় চিন্তা শীল ছিলেন এবং নির্জ্জনে অনেক চিন্তা করিতে করিতে অব শেষে প্রকাশ করিলেন যে, এক ঈশ্বরের পূজা-প্রচারার্থ জগদীশ্বর তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। চত্বারিংশৎ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রমের সময় তিনি এই মত প্রকাশ করিয়া প্রচার করিবার যত্ন পাইলেন। দশ বৎসর পর্য্যন্ত মক্কাবাসিগ এই শান্ত নিরীহ একেশ্বরবাদীকে উপহাস করিতে এব